দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ সফর সফল....

.. পৃঃ ১২

গো-হত্যা বন্ধ করা স্বাধীনতা সংগ্রামেরও অ্যাজেন্ডা ছিল

.. পৃঃ ২৭

৬৭ বর্ষ, ৩৭ সংখ্যা।। ১১ মে ২০১৫।। ২৭ বৈশাখ - ১৪২২।। website : www.eswastika.com

স্বস্তিকা

।। কলকাতা ও আগরতলা থেকে একযোগে প্রকাশিত বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৬৭ বর্ষ ৩৭ সংখ্যা, ২৭ বৈশাখ, ১৪২২ বঙ্গাব্দ

১১ মে - ২০১৫, যুগাব্দ - ৫১১৭,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য, সুকেশ মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৭২৭৮৪১৭৩১৬, ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.-Kol.RMS/48/2013-2015

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন □ ৬-৯

স্বাধীন ভারতের কোনো সরকার নেতাজীর অন্তর্ধান রহস্যভেদ চায়নি □ গূঢ়পুরুষ □ ১০

খোলা চিঠি : নির্বাচনে, নির্বাসনে....?□ সুন্দর মৌলিক □ ১১

প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ সফর শুধুমাত্র সফলই হয়নি, 'ভারতে নির্মাণ'-এর স্বপ্নও ফেরি করেছেন □

মেজর জেনারেল কে কে গঙ্গোপাধ্যায় (অবঃ প্রাপ্ত) □ ১২

গো-জীবন □ মীর মশার্‌রফ হোসেন □ ১৫

ভারতে গো-হত্যা বন্ধের চেষ্টা নতুন নয় □

দেবব্রত চৌধুরী □ ১৬

গোপালন এবং আমাদের অর্থ ব্যবস্থা □

সুতপা বসাক ভড় □ ১৭

গো-সম্পদ ও উত্তরবঙ্গ □ গৌতম কুমার সরকার □ ১৮

লীগের অঘোষিত অনুসরণ □ ডঃ কৃষ্ণকান্ত সরকার □ ২০

চন্দ্রকোণার অযোধ্যার রঘুনাথ মন্দির □ ডঃ প্রণব রায় □ ২১

সেদিন ছিল ফলহারিণী কালিকাপুজো □

নবকুমার ভট্টাচার্য □ ২২

মনুষ্যত্বের আঙ্গিক প্রণাম □ ২৩

গো-হত্যা বন্ধ করা স্বাধীনতা সংগ্রামেরও অ্যাজেন্ডা ছিল □

ভরত ঝুনঝুনওয়ালা □ ২৭

রক্ত-সঙ্কট মোচনে ব্যাপক জনচেতনা প্রয়োজন □

রমাপ্রসাদ দত্ত □ ২৯

যোগে অরুচি? বিয়োগ কর □ অসিতবরণ আইচ □ ৩১

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯ □ **নবাঙ্কুর : ২৪-২৫** □ **অঙ্গনা : ২৬** □ **অন্যরকম : ৩৩** □ **সুস্বাস্থ্য: ৩৫** □ **সমাবেশ-সমাচার : ৩৬-৩৮**□ **রঙ্গম : ৩৯** □ **শব্দরূপ : ৪০** □ **চিত্রকথা : ৪১** □ **প্রাসঙ্গিকী : ৪২**

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

রাসবিহারী ও সুভাষচন্দ্র

নেতাজী-র অন্তর্ধান সম্পর্কিত গোপন ফাইল প্রকাশ্যে আনা নিয়ে গোটা দেশ যখন উত্তাল, ঠিক তখনই রাসবিহারী বসুর মহানিষ্ক্রমণের শতবর্ষ অতিক্রান্ত হচ্ছে সব কোলাহলের বাইরে। সুভাষের সঙ্গে রাসবিহারীর 'বৈপ্লবিক সম্পর্ক', সঙ্গে অনালোচিত দুর্লভ চিঠিপত্র উদ্ধার করে মনোজ্ঞ বিশ্লেষণে ড. প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায়। থাকছে নেতাজী সংক্রান্ত আরও তথ্য।

সত্বর কপি বুক করুন। দাম একই থাকছে— দশ টাকা।।

HB ®
INDIA'S NO. 1 IN
ISI MARKED
HEAVY PIPE FITTINGS

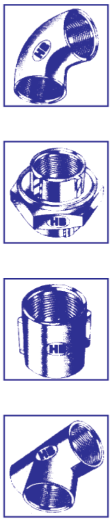

HB ® AN ISO 9002 CERTIFIED CO.
Authorised Distributor
NATIONAL PIPE & SANITARY STORES
54, N. S. Road
Kolkata-700001
Ph : 2210-5831/5833
3, Jadu Nath Dey Road,
Kolkata-12, Ph. 2215-6804,
Fax : 2212-2803
Sister Concern
Partha Sarathi Ceramics
4, College Street,
Kolkata-700012
Ph: 2241 6413 / 5986
Fax : 033-22256803
e-mail : nps@vsnl.net
website ;
www\nationalpipes.com

সানরাইজ ®
সর্ষে পাউডার

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

কাশ্মীরি পণ্ডিতদের প্রত্যাবর্তন জরুরি

জম্মু-কাশ্মীরে বিজেপি এবং পিডিপি যৌথভাবে সরকার গঠন করিলে অনেকে বেশ অবাক হইয়াছিলেন। দু'টি পরস্পরবিরোধী দল কি করিয়া একসঙ্গে সরকারে থাকিয়া শাসন চালাইবেন তাহা লইয়া বহু আলোচনা, সমালোচনা শোনা গিয়াছে। সেইদিন কিন্তু দুইটি দলই বলিয়াছিল জম্মু-কাশ্মীরের বাস্তবিক উন্নতির জন্যই তাহারা সরকার গঠনে মিলিত হইয়াছে। উল্লেখ্য, নরেন্দ্র মোদীর উন্নয়নের শ্লোগানে পিডিপি আস্থা জানাইয়াছিলেন বলিয়াই সরকার গঠিত হইয়াছে। আজ জম্মু-কাশ্মীরের উন্নয়নের লক্ষ্যে দুইটি দলই সচেষ্ট। ইতিমধ্যে সেরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শিল্প এবং পর্যটনে উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন রাজ্যে ভ্রমণ করিতেছেন। শিল্পপতি এবং ভ্রমণকারীদের সেইরাজ্যে আহ্বান জানাইয়াছেন। মুখ্যমন্ত্রী বুঝিয়াছেন, শিল্প এবং পর্যটনের উন্নয়ন ঘটিলেই বিচ্ছিন্নতা কমিবে। প্রথমত, অর্থনৈতিক উন্নয়নই সবকিছুর পরিবর্তন করিয়া দিতে পারে। তবে এই দুইটি দলের জোট সরকার গঠিত হইবার ফলে পাকিস্তান-সহ বিচ্ছিন্নতাবাদীরা হতাশ হইয়া পড়িয়াছে। তাই পাকিস্তানের পক্ষ হইতে মাঝেমাঝেই অশান্তির প্রচেষ্টা চলিতেছে। পূর্বের মতো তাহাদের এই কাজে সহায়তা করিতেছে কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতারা। কাশ্মীর কোনোকালেই পাকিস্তানের হইবে না, ইহা বুঝিয়াও কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতাদের অশান্তি চালাইবার উদ্দেশ্য কি?

বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতারা একদা কাশ্মীরী পণ্ডিতদের সেইরাজ্য ত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছিল। তাহাদের ঘরবাড়ি, জায়গাজমি, ব্যবসা-বাণিজ্য জোর করিয়া এতকাল ভোগদখল করিতেছে। কিন্তু চরম প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পড়িয়াও কাশ্মীরী পণ্ডিতরা জীবনযুদ্ধে পরাজিত হন নাই। উদ্বাস্তু জীবনযাপন করিয়াও তাঁহারা উচ্চশিক্ষিত হইয়াছেন, ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে সারা ভারতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। অপরদিকে আজ তাঁহাদের মুসলিম প্রতিবেশীদের ভবিতব্য অন্ধকার হইয়া উঠিয়াছে।

কাশ্মীরের সমাজ সংস্কৃতিকে বাঁচাইতে হইলে কাশ্মীরি পণ্ডিতদের সেরাজ্যে প্রত্যাবর্তন প্রয়োজন— এই কথা সেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং অন্যান্যরা আজ বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বস্তুত, কাশ্মীরিয়ৎ ভাবধারা এখন উধাও। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রায়শই তাঁহার বক্তব্যে এই অভাবের কথা উল্লেখ করিতেছেন। আর সেইজন্যই তিনি চাহিতেছেন পণ্ডিতরা উপত্যকায় ফিরিয়া আসুন কাশ্মীরিয়ৎকে পুনরুদ্ধার করিতে। কিন্তু হুরিয়ত নেতা আলি শাহ গিলানি, ওমর ফারুক, ইয়াসিন মালিক এবং সাবির শাহের মতো পাকিস্তানপন্থী বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতারা তাহা চান না। তাঁহারা চান অশান্তি। এই বিচ্ছিন্নতাবাদীরা হুমকি দিতেছে একমাস ধরিয়া অমরনাথ যাত্রা বন্ধ রাখিতে হইবে, কাশ্মীরি পণ্ডিতদের কাশ্মীর উপত্যকায় ফিরাইয়া আনা চলিবে না ইত্যাদি বিষয়। এইসব হুমকিকে অগ্রাহ্য করিয়া কাশ্মীরী পণ্ডিতদের পুনর্বাসন প্রকল্পের উদ্যোগ চলিতেছে। মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্টতই জানাইয়াছেন, কোনোক্রমেই অমরনাথ যাত্রা বন্ধ হইবে না। সমস্ত হুমকি কড়া হাতে দমন করা হইবে।

মনে রাখিতে হইবে, কাশ্মীর ভারতে না থাকিলে ভারতও আর সেকুলার থাকিবে না। ভারতের অগণিত মুসলমান সম্প্রদায়ের ভবিষ্যতও পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের মতোই অনিশ্চিত হইয়া পড়িবে। পাকিস্তান এই সত্য যত শীঘ্র উপলব্ধি করিতে পারিবে ততই মঙ্গল।

সুভাষিতম্

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে।। (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৬/৩৫)
হে মহাবাহো! মন নিঃসন্দেহে চঞ্চল এবং একে বসে রাখা দুষ্কর।
কিন্তু হে কুন্তীপুত্র অর্জুন! অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা একে বশ করা যায়।।

অমরনাথযাত্রার সময় কমানোর হুমকি হুরিয়ত নেতা গিলানির

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ শ্রীনগর থেকে ৩৫ কিলোমিটার দূরে পুলওমা জেলার ‘ত্রাল’ অঞ্চলে এক জনসভায় বিচ্ছিন্নতাবাদী হুরিয়ত নেতা সৈয়দ গিলানি হিন্দুদের পবিত্র অমরনাথ দর্শন যাত্রা ৫৯ দিন অবধি চালু না রেখে কাটছাঁট করে ৩০ দিনের মধ্যে শেষ করার প্ররোচনামূলক আহ্বান জানালেন। এই প্রসঙ্গে তিনি উত্তরাখণ্ড-গঙ্গোত্রী যাত্রা যা এক মাস কাল স্থায়ী হয় তারই তুলনা টানেন। অত্যন্ত হীন কৌশল করে তিনি তাঁর বক্তব্য কেবল তীর্থযাত্রীদের নিরাপত্তার জন্যই হচ্ছে— যে কথা জানাতে ভোলেননি। সঙ্গে কাশ্মীরের পরিবেশ রক্ষা করার ক্ষেত্রেও যাত্রার সময়কাল কমিয়ে আনা জরুরি এমনটা জানিয়ে নিজের উদ্দেশ্যকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেন গিলানি।

সভায় কৌশলে কাশ্মীরের শতাব্দী-প্রাচীন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি যাতে ভ্রমণার্থীদের কারণে বিনষ্ট না হয় সে প্রসঙ্গ তুলে প্রচ্ছন্ন হুমকিও দেন এই বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা। গিলানির নেতৃত্বে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের এই সভা শহরাঞ্চলে প্রায় সাত বছরের ব্যবধানে অনুষ্ঠিত হলো। সভায় উপস্থিত জনতাকে পাকিস্তানের পক্ষে স্লোগান দেওয়া শুধু নয় পাকিস্তানি পতাকা ওড়াতেও দেখা যায়। প্রসঙ্গত গত মাসে বিচ্ছিন্নতাবাদী ও অন্তর্ঘাতমূলক কাজকর্মে লিপ্ত থাকা গিলানি অনুগামী মাসরাত আলম জেল থেকে জামিন পাওয়ার পরই পাকিস্তানি পতাকা ওড়ানোর দায়ে আবার জেলবন্দী হয়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে জন নিরাপত্তা আইনে মামলা দায়ের হয়েছে। এদিনের সভায় শ্রীনগরের স্কুলগুলিতে ভর্তি হওয়ার সময়েই ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে ‘স্থায়ী বসবাসকারীর প্রমাণপত্র’ তুলে দেওয়ার ব্যবস্থাকে পশ্চিম পকিস্তান থেকে আসা উদ্বাস্তুদের (হিন্দু) পেছনের দরজা দিয়ে নাগরিকত্ব পাইয়ে দেওয়ার চক্রান্ত বলে তিনি আখ্যা দেন। মুখ্যমন্ত্রী মুফতির ওপর তীব্র বিষোদ্গার করে তিনি বলেন, মুফতি বকলমে আর এস এস-এর ‘মুসলমান বিরোধী’ কার্যক্রমই জম্মু-কাশ্মীরে লাগু করছেন। এ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মুফতি বলেছেন, দেশ বিরোধিতার দায়ে ৫ বছর জেলখাটা হুরিয়তপন্থী মাসরাত আলম ছাড়া পাওয়ার পর তার হাতে পাকিস্তানি পতাকা থাকায় তাকে পুনর্বার গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এক্ষেত্রেও উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে দেরি করা হবে না আর অমরনাথযাত্রাও ৫৯ দিন ধরেই চলবে।

নেপালে ভারতের সেবাকাজের ভূয়সী প্রশংসা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ভূমিকম্প-বিধ্বস্ত নেপালে ভারতের সেবাকাজ প্রশংসিত হচ্ছে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে। গত ২৮ এপ্রিল মার্কিন প্রশাসনের পক্ষে একাজে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের প্রশংসা করা হয়েছে। ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং ন্যাশনাল ডিজাস্টার রিলিফ ফোর্স (এন ডি আর এফ) শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে নেপালের বরপাক এলাকায়। যেটি ছিল এই ভূমিকম্পের মূলকেন্দ্র এবং যার ভয়াবহতায় ওই এলাকায় আর একটি বাড়িও আস্ত নেই। সব ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছে। ভারতীয় বায়ুসেনা চেষ্টা করছে ওই এলাকায় এখনও যাঁরা বেঁচে রয়েছেন, তাঁদের উদ্ধার করে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে নিয়ে যেতে। বায়ুসেনা এপিসেন্টারের নিকটবর্তী পোখরায় এ এন-৩২ পরিবহন বিমান নামাতে সক্ষম হয়েছে এবং কাঠমাণ্ডুর পার্শ্ববর্তী ভূমিকম্প বিধ্বস্ত এলাকায় হেলিকপ্টারের মাধ্যমে ত্রাণ বিলি করা হচ্ছে। ভারতীয়দের পক্ষ থেকেও নেপাল থেকে উদ্ধারের কাজ চলছে পুরোদমে। প্রথম পর্বে ৮০টি বাসে প্রায় চার হাজার ভারতীয়কে ভারত নেপাল সীমান্ত পেরিয়ে উত্তরপ্রদেশের গোরখপুরে নিয়ে আসা হয়েছে। বিমান পথের তুলনায় সুদীর্ঘ রাস্তা দিয়েই ত্রাণ পৌঁছে দেওয়া অনেক সুবিধাজনক বলে মনে করছে সেনাবাহিনী। গোরখপুর থেকে পোখরা পর্যন্ত ২৯০ কিলোমিটার স্থলপথ ভূমিকম্পে প্রভূত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। রাস্তাটির দখল আপাতত সেনাবাহিনীর ইঞ্জিনিয়ারদের হাতে। দ্রুত মেরামতির কাজ চলছে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘেরও কয়েক হাজার স্বয়ংসেবক সেনাবাহিনীর পাশাপাশি সেবাকাজে হাত লাগিয়েছে। রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ-সহ নানান সেবাপ্রতিষ্ঠানকে সেখানে সেবাকাজ করতে দেখা যাচ্ছে।

নেপালের বিভিন্ন হাসপাতালে ভারতীয় ডাক্তারদের পৌঁছে দেবার কাজও আপাতত সারা। চিকিৎসার পাশাপাশি সার্জারির কাজও করছেন তাঁরা। সব মিলিয়ে শেষ সংবাদ পাওয়া পর্যন্ত দু’ হাজার মানুষের চিকিৎসার পাশাপাশি ৫৪০টি ট্রমা কেস ও ৬৫টি সার্জারির গুরুদায়িত্ব সামলেছেন ভারতীয় ডাক্তারেরা। কাঠমাণ্ডুর শহরতলিতে ৪৫ শয্যার একটি হাসপাতালও স্থাপন করেছে ভারতীয় সেনাবাহিনী। বরপাকে আরও ওষুধ ও মেডিকেল টিম পাঠানোর চেষ্টা চলছে বলে সূত্রের খবর। কাঠমাণ্ডু বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া বিদ্যুৎ সংযোগ ফেরাতেও রীতিমতো অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে ভারতের সেনাবাহিনী ও ন্যাশনাল ডিজাস্টার রিলিফ ফোর্স। শুধুমাত্র আর্থিক প্যাকেজ ঘোষণা করেই দায়িত্ব সারেনি ভারত, রীতিমতো কাঁধ মিলিয়ে ভূমিকম্প দুর্গত নেপালের পাশে থাকার বার্তাও তাদের সেবাকাজের মাধ্যমে ভারত দিতে সক্ষম হয়েছে বলেই পর্যবেক্ষকদের অনুমান।

কাশ্মীরে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের ক্ষমতা নির্মূল করার এই সুযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ কাশ্মীরে নতুন জোট সরকার গঠিত হওয়ার পর দেশবাসীর কাছে একটি বড় সুযোগ এসেছে বলে কাশ্মীরস্থিত কিছু বুদ্ধিজীবী মহলের ধারণা। এঁদের অভিমত অনুযায়ী দীর্ঘদিন ধরে ভারত বিরোধী জেহাদ ঘোষণাকারীদের সুদে আসলে মিটিয়ে দেওয়ার এটিই সেরা সময়। যারা বরাবর ভারত-বিরোধী ও পাকিস্তানের সপক্ষে ভারতের মাটিতে সওয়াল করে এসেছে তারা কিন্তু সমান মাত্রায় অতি সম্প্রতিও ভারত-বিরোধী স্লোগান দেওয়ার হিম্মত দেখাচ্ছে। কাশ্মীর উপত্যকায় তাদের এই অপ্রতিহত দাপট দেখানোর কারণ তারা ধরেই নিয়েছে যে তাদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত দুর্বল ও গা-ছাড়া প্রতিক্রিয়া জানানো হবে।

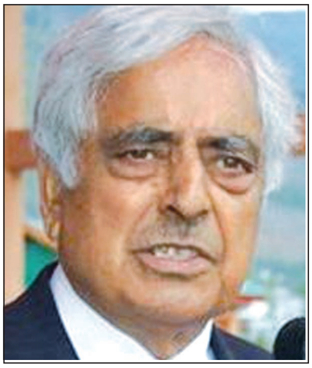

মুফতি মহম্মদ সঈদ

হয়তো বরাবরের মতো আদালতে তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হবে আর এই মামলাগুলির নিষ্পত্তি হতে হতে যুগ কেটে যাবে।

প্রসঙ্গত বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা সৈয়দ আলি যা গিলানি বা তার অঘোষিত আলম তাদের পূর্ব-ঘোষিত ভারতের 'অধিকৃত' কাশ্মীরবাসীকে আজাদি দিতে বদ্ধপরিকর অবস্থান থেকে চুলমাত্র সরেনি। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই ঘৃণ্য কাজে সফল হতে কাশ্মীর ও ভারতের নানান স্থানে অশান্তি বিক্ষোভ সৃষ্টি করতে বরাবরের মতো পাকিস্তানি মদতের কোনো অভাব হবে না।

মজার কথা, পাকিস্তান চিরাচরিতভাবে বলে আসছে বিচ্ছিন্নতাবাদীরাই কাশ্মীরি মুসলমান স্বার্থের যথার্থ প্রতিনিধি। কাশ্মীর সমস্যার চিরস্থায়ী সমাধানে তাদেরই মুখ্যভূমিকা। পাকিস্তান ভুলে যাচ্ছে কাশ্মীরের বাস্তব পরিস্থিতি সম্পূর্ণ আলাদা। সেখানকার রাজনৈতিক বিন্যাস ও জনতার আশা-আকাঙ্ক্ষাও সম্পূর্ণ বিচিত্র পরম্পরার ওপর নির্ভরশীল। জম্মু-কাশ্মীর একীভূত হলে বহুবিধ সংস্কৃতির উত্তরাধিকার বহনকারী।

আজ উপত্যকাবাসী দু' দশকের হিংসা ও হানাহানি দেখে ক্লান্ত। নিরস্ত্র হাজার হাজার মানুষ মৃত। অজস্র শিশু অনাথ। এই পরিস্থিতিতে সৈয়দ গিলানি মাসরাত আলমের মতো দলবল যারা ইতিপূর্বেই Unlowful Activitis (Prevention) -এর ধারায় পড়ে গেছে বা মামলা দায়ের হয়েছে যার মধ্যে Ranbir Penal Code-ও রয়েছে সেই মামলার শুনানিগুলি যত দ্রুত সম্ভব শেষ করা হোক। আদালত যত দ্রুত সম্ভব এগুলির ফয়সালা করে রায় দিক। বুদ্ধিজীবী মহলের বক্তব্য অনুযায়ী, আদালত যদি অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক সাজা দেয় সেক্ষেত্রেও বিচ্ছিন্নতাবাদীরা তাদের বিকৃত রাজনৈতিক মতাদর্শ পরিত্যাগ করবে এমনটা নিশ্চিত নাও হতে পারে। ▌

মালদা-সহ উত্তরবঙ্গে চলছে ব্যাপক গো-নিধন

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ মালদা জেলা সহ সমগ্র উত্তরবঙ্গ জুড়ে ইদের সময় ব্যাপক হারে এবং সারা বছর ব্যাপী গো-হত্যা করে হিন্দু ভাবনাকে আঘাত দেওয়ার প্রবণতা ক্রমশ বাড়ছে। বামফ্রন্ট শাসনকালেও গো-হত্যা হয়েছে কিন্তু প্রকাশ্যে দিবালোকে রাস্তার ধারে নৃশংস ভাবে গো-হত্যা করার সাহস তৃণমূল সরকার ক্ষমতা আসার পরই হয়েছে। মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলার জাতীয় সড়কের ধারে হাজার হাজার মুসলমান হোটেল গজিয়ে উঠেছে যেখানে হোর্ডিং-এ লেখা থাকছে— 'গো-মাংস পাওয়া যায়'। হিন্দু প্রধান এলাকাতেও এখন ইদের সময় পুলিশকে সামনে রেখে গো-হত্যা চলছে। আশ্চর্যের বিষয়, যে সব পুলিশ গো-হত্যা প্রত্যক্ষ করছেন তাঁরা সবাই হিন্দু, অথচ কোনো প্রতিবাদ নেই। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মালদা জেলার ঐতিহাসিক স্থান গৌড়ের গুণমন্ত মসজিদের সামনে প্রতি বছর ১০০-১৫০টি গোরু স্থানীয় খিরকী গ্রামের মুসলমানরা হত্যা করে। স্থানটিতে বনভোজন করা নিষিদ্ধ, অথচ সেখানে গো-হত্যা করা হয়। প্রশাসনকে জানিয়েও কোনো সুফল পাওয়া যায়নি। বর্তমান সীমান্ত এলাকাগুলিতে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়াতে গো-পাচার সামান্য কিছুটা কমলেও গো-মাংস পাচার বৃদ্ধি পেয়েছে। গো-মাংস থলিতে করে পাচারকারীরা কাঁটাতারের ওপারে থাকা বাংলাদেশি পাচারকারীদের ছুঁড়ে দেয়। তারা লুফে নেয় এবং সেভাবেই টাকা পয়সা বিনিময় হয়। রাতের অন্ধকারে কিংবা যেখানে বি. এস. এফের প্রহরা নেই সেখানে এইভাবে গো-মাংস পাচার হচ্ছে সীমান্ত এলাকা জুড়ে। কোথাও বি এস এফ রুখে দাঁড়ালে মাংস ফেলে পাচারকারীরা পালিয়ে যায়। এইভাবে গো-পাচার এবং গো-মাংস পাচার হওয়ার ফলে পশ্চিমবঙ্গে গো-সম্পদ অর্থাৎ দুধ, গোবর সার এবং চাষের গোরুর সংখ্যা ক্রমশ কমছে। মহারাষ্ট্র সহ বেশ কিছু রাজ্য গো-হত্যায় নিষেধাজ্ঞা জারি করে দেশকে দুধ এবং গো-সম্পদ রক্ষায় সহায়তা করেছে। পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু-মুসলমান জনগণ চায় ক্রম-হ্রাসমান গো-সম্পদকে রক্ষা করার তাগিদে এরাজ্যেও গো-হত্যা নিষিদ্ধ করা হোক। ভোট ব্যাঙ্কের কারণেই তা করা হচ্ছে না-বলে বিশেষজ্ঞদের মত।

সংবাদ প্রতিবেদন

নির্বাচন পরবর্তী ধর্মঘট রুখতে শাসকদল ও প্রশাসনের যৌথ সন্ত্রাস

দেবব্রত ঘোষ।। পৌর নির্বাচনে যে ব্যাপক সন্ত্রাস ও রিগিং হয়েছে, তৃণমূলের প্রাপ্ত ভোট বহু জায়গায় ৮৫ শতাংশ বা তারও বেশি হয়েছে যেটা পশ্চিমবাংলা তো বটেই সমগ্র ভারতবর্ষে কোনোদিন হয়নি। এই রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের প্রতিবাদেই বিজেপি এবং সিপিএম-সহ বামদলগুলো ধর্মঘট ডেকেছিল ৩০ এপ্রিল ও কংগ্রেস দলের অনেক নেতাই সেই ধর্মঘটকে সমর্থন করেছিল, এর ফলে তৃণমূল-বিরোধী দলগুলোর প্রকাশ্য কিংবা অপ্রকাশ্য সম্মিলিত প্রয়াস ও প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ অংশগ্রহণ তৃণমূল কংগ্রেসকে বিপাকে ফেলে দিয়েছিল। সেই সম্ভাবনার অগ্রিম আঁচ পেয়েই মুখ্যমন্ত্রীর হুকুমে তার স্তাবক মন্ত্রিকুল ও নেতৃবৃন্দ দলীয় ক্যাডারদের নির্দেশ দিলেন বলপ্রয়োগের মাধ্যমে ও পুলিশ প্রশাসনের মদতে ধর্মঘটকারীদের স্তব্ধ করে দিতে হবে। বাস্তবে সেটাই ঘটলো। ৩০ এপ্রিল ২০১৫ আমরা দেখলাম রাজ্যজুড়ে ধর্মঘট রুখতে তৃণমূল কংগ্রেস ও তাদের দলদাস পুলিশ প্রশাসন কোন পর্যায়ের অত্যাচার চালালো রাজ্য জুড়ে।

৩০ এপ্রিল রাজ্যের দুই প্রশাসনিক ভবন অর্থাৎ নবান্ন এবং কলকাতার বিবাদী বাগে রাইটার্স বিল্ডিং-এ কর্মীদের হাজিরা ছিল মেরেকেটে ৫০ শতাংশ অর্থাৎ ৫০ শতাংশ কর্মী সেদিন কাজে আসেননি। যদিও সরকারি হিসেব অনুসারে হাজিরা ৯০ শতাংশ এর কাছাকাছি। আমরা কিন্তু বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে দেখলাম দুপুর পেরুতে না পেরুতেই সব সরকারি অফিস ফাঁকা হয়ে গিয়েছে অর্থাৎ হাজিরা খাতায় আনুগত্য প্রকাশ করেই কর্মীরা অফিস ছেড়ে বাড়ির পথে হাঁটা দিয়েছেন। একটি প্রথম সারির বৈদ্যুতিন মাধ্যমে দেখলাম আমলাদের অনেকেই অফিসে আসেননি, মন্ত্রীদের মধ্যেও অনেকেই গরহাজির ছিলেন। সরকারি আমলা ও মন্ত্রীরা অজুহাত দেবেন তাঁরা শান্তিরক্ষা ও বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজে অন্যত্র ব্যস্ত ছিলেন বলে অফিসে আসেননি এবং তাঁরা পার পেয়েও যাবেন।

সিপিএম সমর্থকরা কয়েকটা বাস ভাঙচুর করেছেন যেটা অবশ্যই নিন্দনীয় কিন্তু তার চাইতেও অনেক বেশি সংখ্যায় বাস ভাঙচুর করেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের গুণ্ডাবাহিনী। কারণ ওই বাসগুলোর মালিক বা চালকেরা যাত্রীবিহীন বাস চালিয়ে আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ বাড়াতে চাননি। এটা তো সমান ভাবেই দণ্ডনীয়। তাহলে ওই তৃণমূলী গুণ্ডাদের কাউকেই ধরা হলো না কেন? আসলে জনপ্রিয়তায় ভাটার টান এলে শাসকদল মাফিয়া মস্তানের পিঠেই সওয়ার হয় যেমন বর্তমান তৃণমূল কংগ্রেস দলটা হয়েছে।

রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী চরম ঔদ্ধত্যের সঙ্গে বললেন আমরা মাইনে দিই কাজেই স্কুল-কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকারা তাদের কর্মস্থলে আসতে বাধ্য। মাইনেটা জনগণের করের টাকায় দেওয়া হয়, তৃণমূলের দলের মন্ত্রী নেতাদের পকেট থেকে নয়। আমাদের রাজ্যের বর্তমান শাসকদলের নেতারা ২০১১ সালে বিধানসভা নির্বাচনে জনগণের সামনে করজোড়ে ভোট ভিক্ষা করেছিলেন, ভোট পেয়েও ছিলেন। কারণ ৩৪ বছরের বামজমানার অবসান চেয়েছিল সাধারণ মানুষ। ২০১৪ সালের লোকসভা উপনির্বাচনে এবং ২০১৫ সালের পৌর নির্বাচনে আমরা দেখলাম ওই করজোড়ে থাকা হাতগুলো মারমুখী উদ্যত মুষ্টিবদ্ধ হাতে পরিণত হয়েছে। ধর্মঘট করেছে সিপিএম এবং বিজেপি দু-দলই এবং কংগ্রেস খানিকটা অংশ নিয়েছে কারণ তাদের দলে অনেক গোষ্ঠী এবং এক গোষ্ঠী বনধ্ ডাকলে অন্য গোষ্ঠী নীরব থাকে। ধর্মঘটের দিন তৃণমূলী বাইকবাহিনী বা গুণ্ডাবাহিনীর তাণ্ডব রুখতে পুলিশ নিষ্ক্রিয় থেকেছে, অথচ সিপিএম বা বিজেপি-র নিরস্ত্র মিছিল আটকাতে সেই পুলিশ বাহিনী অতি সক্রিয় হয়েছে। অনেক জায়গাতেই তৃণমূলীরা সিপিএম বা বিজেপির পার্টি অফিসে ভাঙচুর চালিয়েছে, বেধড়ক ঠেঙিয়েছে বিরোধী কর্মী ও সমর্থকদের, কারু হাত ভেঙেছে, কারুর মাথা ফেটেছে আর পুলিশ আক্রান্তদের হয় গ্রেপ্তার করেছে বা হেনস্থা করেছে তাদের মুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্য- স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রতি প্রশ্নহীন আনুগত্য প্রকাশ করতে। আমরা দেখলাম সাধারণ মানুষ ধর্মঘট বন্ধ করতে পথে নামেনি, পথে নেমেছে তৃণমূলী গুণ্ডারা এবং দলদাস পুলিশ। বিভিন্ন স্কুলে বা অন্যান্য সরকারি দপ্তরে গিয়ে পুলিশ হাজিরা খাতা পরীক্ষা করেছে, রাস্তায় হকারদের বসতে বাধ্য করেছে। যে রাজ্যে পুলিশ রাজনৈতিক দলদাসে পরিণত হয় সে রাজ্যে সামগ্রিক অবক্ষয় দ্রুতগতিতে হয়ে থাকে। গণতন্ত্রের এই চেহারা হিটলার-স্ট্যালিনের অত্যাচারকে মনে পড়িয়ে দেয়।

আবার বলছি ধর্মঘট সাধারণ মানুষের তো বটেই, সমগ্র রাজ্যের ব্যাপক আর্থিক ক্ষতি করে দেয় কাজেই ধর্মঘট বর্জনীয় কিন্তু নৈতিক ও মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়তে গেলে, প্রতিকার খানিকটা পেতে গেলে, ধর্মঘট ছাড়া বিকল্প কোনো পথও নেই। ■

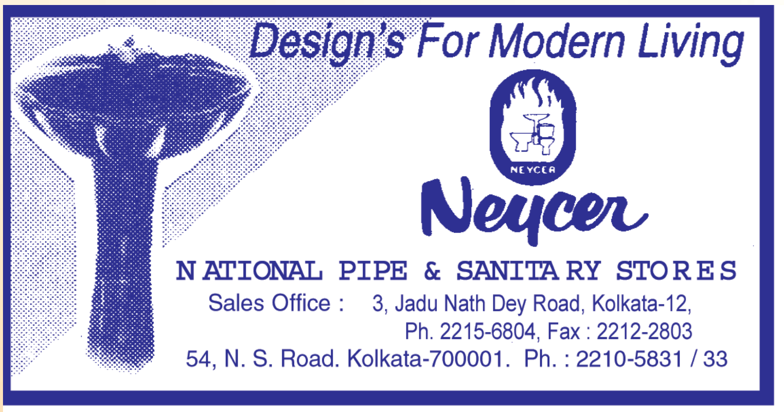

তপশিলিদের জন্য সংরক্ষিত আসনে খৃষ্টান বা মুসলমানদের ভোটে দাঁড়ানো নিষিদ্ধ করল হরিয়ানা হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ গত ১ মে ২০১৫ সালে হরিয়ানা উচ্চ আদালতের বিচারপতি এন কে সাঙ্ঘি তাঁর যুগান্তকারী রায়ে কোনো তপশিলি জাতির জন্য সংরক্ষিত আসনে মুসলমান বা খৃষ্টানদের নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশগ্রহণ বেআইনি ঘোষণা করেছে। রায়ে আরও বলা হয়েছে এ নির্দিষ্ট কেন্দ্রগুলি থেকে কেবলমাত্র হিন্দু, বৌদ্ধ বা শিখ ধর্মাবলম্বীরাই অংশগ্রহণ করতে পারবে। এই মর্মে সংবিধানের ধারা উল্লেখ করে আদালত জানায় তপশিলিদের জন্য চিহ্নিত কোনো কেন্দ্রে নির্বাচনে দাঁড়িয়ে খৃষ্টান বা মুসলমানরা বিশেষ শ্রেণীর জন্য আরোপিত কোনো সুবিধা নিজেরা ভোগ করতে পারে না। সূত্র অনুযায়ী পাঞ্জাবের ভূতপূর্ব মুখ্য সচিব দরবারা সিং গুরু পাঞ্জাবের জনপ্রিয় লোকসঙ্গীত গায়ক ও কংগ্রেস বিধায়ক মহম্মদ সাদিকের কাছে নির্বাচনে পরাজিত হওয়ার পর হরিয়ানা আদালতে মামলা দায়ের করেন। তারই ফলশ্রুতিতে আদালত এই রায়ে বলেছে, অবশ্যই খৃষ্টান ও মুসলমানরা তপশিলি সংরক্ষিত কেন্দ্র থেকে নির্বাচন লড়ার যোগ্যতা অর্জন করবে যদি তারা হিন্দু, বৌদ্ধ বা শিখ ধর্ম গ্রহণ করে এবং প্রমাণ করতে পারে যে তাদের পূর্ব পুরুষরা ওই তিনটির মধ্যে যে কোনো একটি ধর্মাবলম্বী ছিলেন। শুধু তাই নয়, তাদের এও প্রমাণ করতে হবে যে উক্ত তিনটি ধর্মের অধীনেই (যে কোনোটির) তাঁরা তপশিলিভুক্ত ছিলেন। ওয়াকিবহাল মহলে এই ঐতিহাসিক রায় নিয়ে ইতিমধ্যেই শোরগোল পড়ে গেছে। ভবিষ্যতে বৃহত্তর শিক্ষা ও চাকুরির ক্ষেত্রে খৃষ্টান ও মুসমানদের সংরক্ষণের ওপর এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা। বিচারপতি তাঁর রায়ে বলেছেন 'the conversion from one religion to another would dis-entitle the person to carry his caste with him after conversion' অর্থাৎ কেউ ধর্ম পরিবর্তন করে থাকলে সে তার আগের ধর্মের জাতিগত পরিচয় দিয়ে কোনো সুবিধে নিতে পারে না। প্রসঙ্গত বিচারক সাঙ্ঘি ভাদুয়ার সংরক্ষিত কেন্দ্র থেকে কংগ্রেসের মহম্মদ সাদিকের ২০১২ সালের নির্বাচন বাতিল করেছেন।

ভেঞ্চার ক্যাপিটাল বিনিয়োগের ক্ষেত্রে চীনকে ছাপিয়ে গেল ভারত

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ ব্যবসা করার ক্ষেত্রে ভারতে যে যথেষ্ট সুযোগ ও উপযুক্ত ক্ষেত্র রয়েছে সেই নিরিখে ২০১৫ সালের প্রথম ত্রৈমাসিক হিসেব বিদেশ অনুযায়ী 'উদ্যোগিক ঝুঁকি' (venture capital) নেওয়ার ক্ষেত্রে ভারত চীনকে পেছনে ফেলে দিয়েছে।

Venture capital বলতে বোঝায় ভবিষ্যতে বিপুল সম্ভাবনাময় ব্যবসায়িক উদ্যোগগুলির শুরুর সময়ে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করতে পারার যোগ্যতা। সম্প্রতি প্রকাশিত নিউ ইয়র্কস্থিত C B Insight নামের যে সংস্থাটি পৃথিবীব্যাপী এই ভি সি নিয়ে সমীক্ষা চালিয়ে পরিসংখ্যান তৈরি করে থাকে তাদের তথ্য অনুযায়ী আলোচ্য ত্রৈমাসিকে ভারতে নবীন ব্যবসায়িক উদ্যোগে টাকা ঢালার সংখ্যা ৬৯ যেখানে চীনের ক্ষেত্রে এই সংখ্যা ৬৬। এটি একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ মানদণ্ড বলেই অর্থনৈতিক দুনিয়ায় মান্যতা পেয়ে আসছে। প্রসঙ্গত, সমস্ত এশীয় মহাদেশের মধ্যে ভারতের ক্ষেত্রেই সর্বাধিক উদ্যোগ শুরু হয়েছে। ২০১৪ সালে এই ক্ষেত্রে প্রথম ত্রৈমাসিকে বৃদ্ধির মাত্রা ছিল ৪৩ শতাংশ যা ২০১৫ সালের একই সময়ে ৬০ শতাংশ ছুঁয়েছে। তবে সংখ্যার দিক দিয়ে এগিয়ে থাকলেও টাকার হিসেবে অর্থাৎ নিয়োজিত পুঁজির নিরিখে চীন এখনও অনেক এগিয়ে আছে। আলোচ্য সময়ে চীনের বাস্তবায়িত হওয়া বিনিয়োগের প্রাথমিক পরিমাণ ২.১৯ বিলিয়ন ডলার, ভারতে সেই পরিমাণ ১.৩৫ বিলিয়ন ডলার। প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, ২০১৫ সালের প্রথম ত্রৈমাসিকে পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের থেকে ভেঞ্চার ক্যাপিটালের ক্ষেত্রে ভারতে বৃদ্ধির পরিমাণ টাকার অঙ্কে ২২৫ শতাংশ। এই ক্ষেত্রে জাপানে সই হওয়া চুক্তির সংখ্যা ২৮টি। এশিয়ার সমস্ত দেশগুলিতে নিয়োজিত অর্থের মধ্যে ভারত, চীন ও জাপানের মিলিত পরিমাণ ৬৬ শতাংশ। এই প্রসঙ্গে গুগল পরিচালিত এই স্টার্ট আপ সমীক্ষণের কর্তা সুনীল রাও জানাচ্ছেন, ভারতের ক্ষেত্রে এই উদ্যোগ সঠিক পথেই এগিয়ে চলেছে। প্রসঙ্গত, ১০ শতাংশ জিডিপি বৃদ্ধির আগের সময়ে ২০০৭-০৮ সালে চীনে ঠিক এই রকমই অর্থ ও সংখ্যায় প্রারম্ভিক বিনিয়োগ শুরু হয়েছিল। এই ক্ষেত্রে পরপর তিনটি ত্রৈমাসিকেই ভারত ১ বিলিয়ন ডলারের অধিক নতুন বিনয়োগ ধরে রেকর্ড গড়েছে। ভারতের অভ্যন্তরীণ নিরাশাবাদীদের কাছে খবরটি পৌঁছনো জরুরি। ■

স্বাধীন ভারতের কোনো সরকার নেতাজীর অন্তর্ধান রহস্যভেদ চায়নি

যে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু করেননি, দেশের প্রথম অ-কংগ্রেসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই আগ্রহ দেখাননি, বিজেপি নেতৃত্বে গঠিত দেশের প্রথম এনডিএ সরকারের প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী প্রতিশ্রুতি দিয়েও পিছিয়ে গিয়েছিলেন, সেই কাজটি এবার করতে চাইছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর রহস্যময় অন্তর্ধানের অতি গোপনীয় সরকারি ফাইল তথ্য জানার অধিকার আইনের আওতায় আনতে। অর্থাৎ সাধারণ মানুষ চাইলে এইসব ফাইল পড়ে দেখতে পারবেন। প্রশ্ন হচ্ছে, অমলাতন্ত্রের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে তিনি পারবেন কী নেতাজীর গোপন ফাইল প্রকাশ করতে। হ্যাঁ, সেটাই এখন দেখার। বাজপেয়ী পারেননি, মোদী পেরেছেন এমন কথা বলার সময় এখনও আসেনি।

সাম্প্রতিকালে নরেন্দ্র মোদী তাঁর জার্মানি সফরের সময় এক সাক্ষাৎকার বসু পরিবারের সদস্য সূর্যকুমার বসুকে প্রতিশ্রুতি দেন ভারত সরকারের কাছে নেতাজী সংক্রান্ত যে সব ফাইল আছে তা উন্মুক্ত করতে তিনি উদ্যোগী হবেন। দেশে ফিরে তিনি একটি উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠন করে নেতাজী ফাইল কেন প্রকাশ করা যাচ্ছে না সে সম্পর্কে দ্রুত রিপোর্ট দিতে বলেছেন। এই কলম লেখার সময় সেই রিপোর্ট প্রধানমন্ত্রী হাতে পাননি। তবে রাজ্যসভায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী হরিভাই প্রতিভাই চৌধরী জানিয়েছেন, নেতাজীর সম্পর্কে বৃটিশ গোয়েন্দাদের লেখা মোট ৮৯টি অতি গোপনীয় ফাইল সরকারের কাছে আছে। এর মধ্যে ২৯টি ফাইল আছে কেন্দ্রীয় বিদেশ দপ্তরে এবং ৬০টি ফাইল আছে প্রধানমন্ত্রীর অফিসে। এছাড়া জানা গেছে যে সর্বাধিক গুরত্বপূর্ণ ২টি ফাইল ১৯৬৯ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে পুড়িয়ে ফেলা হয়। আরও দু'টি গোপন ফাইল প্রধানমন্ত্রীর অফিস থেকে ১৯৭২ সালে রহস্যজনকভাবে অদৃশ্য হয়ে যায়।

নেতাজীর অন্তর্ধান রহস্যভেদে ভারত সরকার বেশ কয়েকটি তদন্ত কমিশন গঠন

গূঢ় পুরুষের

কলম

করেছিল। নেহরুর আমলে শাহনওয়াজ কমিশন, মোরারজী দেশাইয়ের সময় খোসলা কমিশন এবং সাম্প্রতিককালে মনোজ কুমার মুখার্জি কমিশন। এই তিনটি কমিশনকেই ভারত সরকার বৃটিশ গোয়েন্দাদের লেখা গোপন সরকারি ফাইল দেখতে দেয়নি। নিট ফল, নেতাজীর অন্তর্ধান রহস্যভেদ হয়নি। তবে মুখার্জি কমিশন স্পষ্টভাবে রায় দিয়েছিল যে, ১৯৪৫ সালের ১৮ আগস্ট ফরমোজার তাইহোকু বিমান ঘাঁটিতে কোনো বিমান দুর্ঘটনা ঘটেনি। তাই সেই কল্পিত বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যু ঘটতে পারে না। শাহনওয়াজ এবং খোসলা কমিশন অবশ্য ঘোষণা করেছিল যে, নেতাজীর মৃত্যু হয় ওই বিমান দুর্ঘটনাতেই। মুখার্জি কমিশন (১৯৯৯-২০০৫) আবেদন জানিয়েছিল ৮৯টি গোপন ফাইলের মধ্যে ৩৯টি ফাইল কমিশনকে দেখতে দেওয়া হোক। বাজপেয়ী সরকার সেই আবেদন খারিজ করে জানায় যে ওইসব ফাইল উন্মুক্ত হলে ভারতের পররাষ্ট্র নীতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাছাড়া বৃটিশ গোয়েন্দাদের রিপোর্ট প্রকাশিত হলে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ভাবমূর্তি কলঙ্কিত হবে।

দিল্লীর ইংরাজি দৈনিক হিন্দুস্থান টাইমসের সাংবাদিক অনুজ ধর তাঁর 'ব্যাক ফ্রম ডেড' বইটিতে খোলাখুলিভাবে লিখেছেন যে, মুখার্জি কমিশনের তদন্তে প্রতিপদে বাধা দিয়েছিল তদানীন্তন বাজপেয়ী সরকার। এই বাধার কথা রেকর্ড করতে বলেন বিচারপতি মনোজ কুমার মুখার্জি। কমিশনের সদস্যরা সরেজমিন তদন্ত করতে রাশিয়া যেতে চেয়েছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকার অনুমতি দেয়নি। অথচ কমিশনের সামনে বহু সাক্ষী হলফ করে বয়ান দেন যে, নেতাজী মাঞ্চুরিয়ার পথে সোভিয়েত রাশিয়ায় আশ্রয় নেন। রাশিয়ার কমিউনিস্ট ডিকটেটর জোসেফ স্ট্যালিন তাঁকে বন্দি করে সাইবেরিয়ার গুলাগে পাঠিয়ে দেন। তখন পশ্চিম দুনিয়ার সঙ্গে সোভিয়েতের কোল্ড ওয়ার চলছে। ভারতকে বৃটিশ ও মার্কিন প্রভাবমুক্ত করার কাজে স্টালিন নেহরুকে ব্ল্যাকমেল করতে নেতাজীকে ব্যবহার করেন। অতি বৃটিশ ভক্ত নেহরু রাতারাতি লাইন পাল্টে সোভিয়েত ব্লকে যোগ দেয়। ভারতের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রুশ অর্থনীতিবিদরা ছকে দেয়। যদিও নেহরু দাবি করেছিলেন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা তাঁর মস্তিষ্ক প্রসূত। সে অন্য কথা। নেতাজী সম্পর্কে রুশ গুপ্তচর সংস্থা কেজিবি-র অনেক গোপন ফাইল আছে। মুখার্জি কমিশন সেইসব ফাইল দেখতে চাইলে রুশ সরকার সম্মতি দেয়। কিন্তু ভারত সরকার মস্কো যাওয়ার অনুমতি দেয়নি। কেন? ১৯৪৭ সালের পর কোনো স্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার চায়নি নেতাজীর অন্তর্ধান রহস্যভেদ হোক। এই প্রথম দেশের কোনো প্রধানমন্ত্রী উৎসাহ দেখালেন। তবে আমলাতন্ত্রকে উপেক্ষা করে গোপন ফাইল প্রকাশিত হবে কী হবে না ভবিষ্যৎ তা বলবে। নেহরু যা চাননি, বাজপেয়ী যা পারেননি, মোদী সেই কাজ করতে পারলে জনমানসে তাঁর ভাবমূর্তি নিঃসন্দেহে উজ্জ্বল হবে। ▌

নির্বাচনে, নির্বাসনে.... ?

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী
কালীঘাট

দিদি, পুরভোটে সাফল্যের জন্য অভিনন্দন। তবে একটা দুঃখ রয়ে গেছে। আমি চেয়েছিলাম পুরোভোটে পুরো জয় আসবে। কিন্তু বিরোধীরা কয়েকটা দখল করল কী করে ভেবে পাচ্ছি না। তবুও যা ফল হয়েছে আমার মনে হয় এই রাজ্যটাকে আগামী ৯৯ বছরের জন্য তৃণমূল কংগ্রেসকে লিজ দিয়ে দেওয়া হোক। যেখানে কোথাও কোথাও যাবতীয় অঙ্ক বাস্তবকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে ১৪০ শতাংশ পর্যন্ত মানুষ আপনাদের ভোট দিয়েছেন সেখানে তো ভোটাভুটি ব্যাপারটারই আর দরকার নেই।

তবে দিদি আমি ভোট দিইনি। মানে দিতে হয়নি। বাসা চেঞ্জ করলেও আমার ভোটটা পুরনো শহরে রয়ে গেছে। আসলে শিকড়ের টান হিসেবেই ভোটার লিস্টে আগের ঠিকানায় আছি। পৈতৃক সেই বাড়িটা তো আছেই। প্রায়ই যাই সেখানে কিন্তু ভোটের দিনটা হয় উপরি যাওয়া। সবাই এক হওয়া এই উৎসবটা দীর্ঘদিনের। দিদি- বোনেরাও আসে। কিন্তু এবার আর পয়সা খরচ করে যেতে হলো না। আগের দিনই তৃণমূল প্রার্থী ফোন করে জেনে নিয়েছিলেন কখন আসছি। আর তারপর সকাল হতেই আমার তৃণমূল কংগ্রেস ভাইয়ের ফোন... দাদা রোদের মধ্যে বের হতে হবে না... সকালে তোর ভোটটা দিয়েই খাতা খুলেছি। কেন? মানে... আমার ভোট আমি... হয়ে গেছে...। ইদানীং তোর চিঠিপত্র পড়ে তোর মতিগতি ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। তাই রিস্ক নিলাম না...। ভাইয়ের কথাগুলো শুনতে শুনতে দিদি প্রথমে আমার যে অনুভূতিটা হয়েছিল শুদ্ধ বাংলায় তাকে বলে 'বিবমিষা'। ফেসবুকে লিখেও ফেলেছিলাম। তারপর অনেক মজার মজার মন্তব্য করল। একজন তো ইউরিন টেস্টও করতে বলে দিল। না দিদি, আমি বমি করিনি। আমার মতো অনেকেই বমি চেপে রেখেছে।

শনিবার ছিল ভোট আর রবিবার সকাল থেকেই বাজার, চায়ের দোকান, যেখানেই কয়েকটা মাথা একসঙ্গে হয়েছে, শোনা গিয়েছে ভোট দিতে পারলেন? কেমন ভোট হলো তোদের ওয়ার্ডে? ভোট তো হলো সকালেই ঘণ্টা দুয়েক, তারপর তো লুঠ। হাতে কালি লাগিয়ে ছেড়ে দিল... কোথাও ভোট দিতে গিয়ে শুনতে হয়েছে, 'ভোট পড়ে গিয়েছে', কোথাও আবার বুথের সামনে মারামারি দেখে পিছিয়ে যেতে হয়েছে, কোথাও বুথে গিয়ে দেখা গেল গোলমালের জেরে ভোট প্রক্রিয়াই স্থগিত। পুলিশ ছিল, প্রশাসন ছিল তবু...। ভোট দিতে পারলাম কই।

তবুও দিদি আপনি জিতেছেন। গোলমালগুলো না হলেও কি জিততে পারতেন না? বামেদের আপনি সত্যিই পরাস্ত করেছেন মানুষের ভোটে। কংগ্রেসের মেরুদণ্ড আপনি ভেঙে দিয়েছেন অনেক আগেই। এরপর রাজ্যে নতুন শক্তি নিয়ে প্রতিপক্ষ হয়ে উঠেছিল বিজেপি। কিন্তু সম্ভাবনাকে কীভাবে নষ্ট করতে হয় তা দেখিয়ে দিয়েছে তারা। সংগঠন মজবুত করার থেকে তৃণমূলের ত্রুটি খুঁজতে গিয়ে নিজেদের পায়েই কুড়ুল মেরেছে। অপ্রিয় হলেও এটা সত্যি। আপনাদের বাহিনীর কাছে বিজেপি-র সাংগঠনিক প্রস্তুতি একেবারেই নগণ্য ছিল। আর যেটুকু ছিল সেটুকুকেও আপনারা অতি সুচারুভাবে তছনছ করে দিয়েছেন এই পুরভোটে। জানি না চিরদিন সেটা সম্ভব হবে কিনা? এই নির্বাচনে সার্বিকভাবে বিরোধীরা নির্বাসনে— এটা মানতেই হবে। কিন্তু গণতন্ত্রও কি নির্বাসনে গেল না? দিদি আপনি কি দিদি ভোটারদের ওপর আর আস্থা রাখতে পারছেন না? আপনি তো জননেত্রী? আপনার ডাকে তো কত মানুষ রাস্তায় নামে? তবে এত ছাপ্পা কেন? এত প্রহসন কেন? ভোট করতে গোপাল তিওয়ারি লাগল কেন?

— **সুন্দর মৌলিক**

প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ সফর শুধুমাত্র সফলই হয়নি, 'ভারতে নির্মাণ'-এর স্বপ্নও ফেরি করেছেন

মেজর জেনারেল কে কে গঙ্গোপাধ্যায় (অঃ প্রাঃ)

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিদেশ সফর ভারতে এবং ভারতের বাইরে বিশেষ করে ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের মধ্যে প্রচণ্ড উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছে। বর্তমানে তিনি ফ্রান্স, জার্মানি ও কানাডার সাম্প্রতিক সফর সেরে ভারতে ফিরে এসেছেন। সরকারি নেতৃত্বের পূর্বেকার বিদেশ সফরের তুলনায় প্রধানমন্ত্রীর এই সফরগুলি শুধুমাত্র শুভেচ্ছা সফর নয়। তিনি বিশ্বের দরবারে ভারতে অর্থ নিবেশ ও শিল্প স্থাপনের অনুকূলে জোরদার প্রয়াস করেছেন। বোঝাতে চেয়েছেন, বিশ্বের উন্নতিশীল রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ভারত অন্যতম যেখানে সাফল্যের সুযোগ অফুরন্ত। তাঁর কথায়, ''ভারতের গণতন্ত্র, ভারতের মানব সম্পদ এবং চাহিদার এমন সংমিশ্রণ বিশ্বে আর কোথাও পাওয়া যাবে না।'' শিল্প প্রতিষ্ঠানের নির্মাণকেন্দ্র হিসাবে ভারতকে তুলে ধরার সম্যক প্রয়াস তিনি করেছেন, তাঁর মন্ত্র 'ভারতে নির্মাণ কর'।

স্বভাবতই ভারতে এবং বিশ্বের সর্বত্র তাঁর ফ্রান্স, জার্মানি ও কানাডা সফরের বিভিন্ন তথ্য দিয়ে সংবাদমাধ্যম শিরোনাম লিখেছে।

ফ্রান্স :

ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি ফ্রাঙ্কোইস হল্যান্ডের সঙ্গে তাঁর বিশদ আলোচনা হয়েছে। শিল্প এবং বাণিজ্য কর্ণধারদের সঙ্গেও তিনি গোলটেবিল বৈঠক করেন। এই আলোচনার মূল মন্ত্রই ছিল 'ভারতে নির্মাণে আগ্রহী হন'। তিনি ফরাসি রাষ্ট্রপতির সঙ্গে 'মেইন' নদীতে নৌকাবিহার করার সময়ও বিশ্বের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন।

মহারাষ্ট্রের জৈতাপুর পরমাণু প্রকল্প নিয়ে 'লার্সেন ও টুব্রো' এবং 'আরেভা'র মধ্যে একটা মউ স্বাক্ষরিত হয়েছে। উদ্দেশ্য নির্মাণ ব্যয় কীভাবে কমানো যায় এবং সর্বাধুনিক প্রযুক্তি কীভাবে হস্তান্তর করা সম্ভব হবে।

ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা এবং ফ্রান্সের রাষ্ট্রীয় মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্রের মধ্যেও এক মউ স্বাক্ষরিত হয়। এই কেন্দ্রের উপগ্রহ ভারতের পি এস এলভি রকেটে ১২ অক্টোবর ২০১১-তে উৎক্ষেপিত হয়েছিল।

বিগত কয়েক বছর যাবৎ ভারত ও ফ্রান্সের মধ্যে 'রাফাল' যুদ্ধ বিমান ক্রয়ের ক্ষেত্রে আলোচনায় জট বেঁধেছিল। মোদী এই বিষয়ে নতুন সূত্র বের করলেন এবং ভারত সরকার ও ফরাসি সরকারের মধ্যে চুক্তি করে ৩৬টি বিমান যত শীঘ্র সম্ভব প্রস্তুত করে ভারতে পাঠাবার চুক্তি স্বাক্ষর করেন। বাকি বিমানগুলি ভারতে নির্মাণের বিষয়ে আরও আলোচনা হবে। অনেকেই প্রশ্ন করছেন 'ভারতে নির্মাণ কর' মন্ত্রের কি জলাঞ্জলি হলো? কিন্তু যখন ভারতীয় বিমান বাহিনীর ভাঁড়ারে যুদ্ধ করার মতো সচল বিমান তলানিতে এসে ঠেকেছে, তখন এই ৩৬টি বিমান যে অনেক মানসিক শক্তি জোগাবে সেটা প্রধানমন্ত্রী অনুধাবন করেছেন। একই সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বিমান নির্মাণ সংস্থা এয়ারবাস ইন্ডাস্ট্রিজ ভারতের সঙ্গে একটা মউ স্বাক্ষর করে তাদের বিমানের বহু যন্ত্রাংশ ভারতে নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। ফলে এই প্রকল্পে যেখানে ভারতে ৪০০ মিলিয়ন 'ইউরো'র কাজ হোত, সেখানে অন্তত দুই বিলিয়ন ইউরোর কাজ হওয়ার সম্ভাবনা উৎপন্ন হয়েছে। এছাড়া স্পোর্টস মেডিসিন এবং মহিলা ও প্রতিবন্ধীদের খেলাধুলার ক্ষেত্রে সাহায্যের জন্য ভারত-ফ্রান্স মউ নতুন করে স্বাক্ষরিত হয়েছে।

দ্রুতগামী রেল চলাচলের জন্য দিল্লী-চণ্ডীগড় রেল লাইনটিকে পরীক্ষামূলক ভাবে উন্নয়ন করা হবে এবং সফল হলে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে রেল পরিষেবা দ্রুতগামী অর্থাৎ ঘণ্টায় ২০০ কিলোমিটার গতিবেগ না হলেও কিছুটা কম গতির রেলপথে উন্নয়নের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ফ্রান্স এইসব প্রকল্পে দুই বিলিয়ন ইউরো বিনিয়োগের অঙ্গীকার করেছে।

প্রধানমন্ত্রীর ফ্রান্স সফর সর্বাঙ্গসুন্দর ও সফল হয়েছে একথা বলা যেতেই পারে। ফ্রান্স থেকে বিদায় নেওয়ার আগে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শহীদদের সম্মান জানানোর সময় তিনি সদম্ভে ঘোষণা করেছেন, রাষ্ট্রসঙ্ঘের সুরক্ষা সমিতিতে স্থায়ী আসনের

ফরাসি রাষ্ট্রপতির সঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী।

জার্মান চ্যান্সেলর অ্যাঞ্জেলা মারকেলের সঙ্গে নরেন্দ্র মোদী।

জন্য ভারত কারও কাছে ভিক্ষা চাইছে না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ১০ হাজার ভারতীয় সৈনিক শহীদ হয়েছেন, তারপর বিশ্বের বিভিন্নপ্রান্তে শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে ভারত যত সৈন্যবাহিনী পাঠিয়েছে, বিশ্বের অন্য কোনো রাষ্ট্র তার ধারে কাছে নেই। বুদ্ধদেব ও মহাত্মা গান্ধীর ভারত নিজ অধিকারেই এই দাবি করছে। এমন সদম্ভ দাবি এর আগে ভারত আর কখনও জানায়নি। স্বভাবতই বিশ্বের একমাত্র শক্তি যারা ভারতকে সুরক্ষা সমিতিতে স্থায়ী সদস্য হিসাবে দেখতে অনিচ্ছুক, সেই চীন মত প্রকাশ করেছে, আগামী দিনে রাষ্ট্রসঙ্ঘে পুনর্গঠন হলে তারা ভারতের সদস্যপদ সমর্থন করতে প্রস্তুত। তারা ভুলে গেছে, ভারতই চীনের সদস্যপদের জন্য সমর্থন ও তদ্বির করেছিল, আজ তারা বলছে 'পুনর্গঠন', পাকিস্তানকেও নিতে হবে ইত্যাদি!

জার্মানি :

ফ্রান্স সফর সেরে প্রধানমন্ত্রী মোদী এবার জার্মানিতে পদার্পণ করলেন। জার্মানিতে পদার্পণ করে নরেন্দ্র মোদী প্রথমেই জার্মান চ্যান্সেলর অ্যাঞ্জেলা মারকেলের সঙ্গে হ্যানোভায় সুপ্রসিদ্ধ শিল্পমেলার উদ্বোধন করেন। এই বছর ভারত এই মেলার প্রধান অংশীদার (পার্টনার)।

উভয় নেতাই এই উপলক্ষে ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন এবং ভারতের মধ্যে শুল্করহিত বাণিজ্যের বিষয় উত্থাপন করেন। নরেন্দ্র মোদী ঘোষণা করেন, এটা সম্ভব হলে ভারত বিশ্বের প্রথম সারির 'নির্মাণ কেন্দ্র' হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে পারবে। জার্মানির শিল্পপতি এবং উদ্যোগপতিদের তিনি মনে করিয়ে দেন ভারতের বিষয়ে প্রাচীন ধারণা নিয়ে তাঁরা যেন বিবেচনা না করেন। ভারতে এসে শিল্প-বাণিজ্য বিষয়ে নীতির পরিবর্তন অনুভব করুন, তারপর স্থির করুন ভারতে 'নির্মাণকেন্দ্র' গড়ে তুললে উভয়পক্ষের কতটা লাভ অথবা লোকসান হবে। তিনি একথাও বলেন, প্রয়োজনমতো বিভিন্ন নিয়মকানুন সংশোধন করতে তিনি বদ্ধপরিকর। নিয়মকানুনের সঙ্কীর্ণ বাধ্যবাধকতা ভারতকে বিশ্বের নির্মাণকেন্দ্র হওয়া রোধ করতে পারবে না। উভয়-নেতাই এই বিষয়ে একটা ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন যে, সমিতি শহরাঞ্চলের বিকাশের বিভিন্ন দিক অধ্যয়ন করবে। নরেন্দ্র মোদী শিল্পপতিদের জানান, জার্মান শিল্প ও বাণিজ্যিক গোষ্ঠীর সুবিধার জন্য তিনি একটি বিশেষ ব্যবস্থা করবেন, যেমনটা জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য করা হয়েছে। ভারতীয় প্যাভেলিয়নে ভারতের সিংহমূর্তি দেখিয়ে বলেন, ''ভারতে নির্মাণ কর, এটাই নতুন ভারতের প্রতীক।' বার্লিনে ভারতীয় বংশোদ্ভূত জার্মান অধিবাসীদের ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর সম্মান সমারোহে আবহাওয়ার পরিবর্তনে প্রতিকূল প্রভাব দূর করতে ভারত যারপরনাই প্রয়াস নিশ্চয়ই করবে। কিন্তু বিশ্বে আবহাওয়ার প্রতিকূলতার জন্য ভারত যে বিন্দুমাত্র দায়ী নয়, একথাও সকলকে স্বীকার করতে হবে। এরজন্য ভারতকে কোনো কৈফিয়ৎ দিতে হবে না। উভয় রাষ্ট্রের নেতাই একমত ছিলেন যে ভারত ও জার্মানির বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে যোগাযোগ এবং আদানপ্রদান আরও গভীর হওয়া প্রয়োজন। ভারত কখনই মাক্সমুলারকে ভুলতে পারবে না। প্রধানমন্ত্রী মোদী ঘোষণা করেন, বিশ্ব যখন হানাহানি ও অস্থিরতার মধ্যে চলেছে, শিল্প-বাণিজ্য তলানিতে তখন ভারতই একমাত্র উন্নতিশীল রাষ্ট্র, যেখানে কোনো অস্থিরতা নেই, শিল্প-বাণিজ্যের অনুকূল বাতাস ওই দিকেই বইছে, সেইজন্যই ভারত আজ বিশ্বের দ্রুততম বর্ধিষ্ণু অর্থনীতি হতে চলেছে।

কানাডা :

সফরের শেষ রাষ্ট্রটি ছিল কানাডা। কানাডায় বসবাসকারী ১২ লক্ষ ভারতীয় বংশোদ্ভূত কানাডাবাসীর নিকট নরেন্দ্র মোদী শুধু একটা বার্তাই দিতে চেয়েছিলেন, 'ভারত শক্তিশালী রাষ্ট্র কিন্তু ভারতের প্রয়োজন একটু সুযোগ'। কানাডায় বসবাসকারী ভারতীয় মানুষ সেই সুযোগটুকু ভারতকে পাইয়ে দিতে সহায়তা করতে পারেন। টরেন্টোর 'রিকো কলিজিয়মে' প্রায় দশ হাজার ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্য করে প্রধানমন্ত্রী এই বার্তাটাই দিয়েছিলেন। এর ফলে ভারতের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা লাভবান হবেন। এই ভাষণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মাত্র কিছুদিন আগে ম্যাডিসন স্কোয়ারের জনউন্মাদনা মনে করিয়ে দিচ্ছিল।

কানাডার প্রধানমন্ত্রী স্টিফেন হারপারের সঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর বিশ্বের বিভিন্ন সমস্যা এবং ভারত-কানাডার সম্পর্ক নিয়ে বহুক্ষণ আলোচনা হয়। যার ফলস্বরূপ প্রধানমন্ত্রী হারপার ভারতকে ইউরেনিয়ম

রপ্তানি করতে সম্মত হন। উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে দীর্ঘ সময়ের জন্য ওই রপ্তানি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। কানাডা প্রথম থেকেই ভারতের প্রতি বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, সঙ্কীর্ণ বাধা নিষেধ ধর্তব্যের মধ্যে আনেনি, যেমন ১৯৫০ ও ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে কানাডাই প্রথম ভারতকে হেভি ওয়াটার রিঅ্যাক্টর বিক্রয় করে। বর্তমানে তারা পরমাণু ইন্ধনের প্রযুক্তি আরও উন্নত করেছে, ফলে কানাডার ওই প্রযুক্তিতে ভারত লাভবান হবে। খনিজ তেল ও গ্যাস আহরণ ও প্রক্রীয়াকরণেও কানাডা উন্নত প্রযুক্তির অধিকারী। ভারতীয় ছাত্র ও যুব সমাজকে উপযুক্ত জ্ঞান কৌশলের অধিকারী হওয়ার জন্য শিক্ষা ক্ষেত্রে কানাডা সাহায্য করতে পারে। যাতে 'ভারতে নির্মাণ কর' মন্ত্রে কাজ হলে ওই যুবসমাজ কাজ পাবে এবং বিশ্বের শিল্পপতিরা কর্মকুশল কর্মীর অভাব ভারতে অনুভব করবেন না। উভয় রাষ্ট্রনেতা এই বিষয়ে যোগাযোগ করতে রাজি হয়েছেন।

ভারতে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে উন্নতিবিধানের নিমিত্ত কানাডার গ্র্যান্ড চ্যালেঞ্জেস এবং ভারতের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রকের বায়োটেকনোলজি বিভাগ ২.৫ মিলিয়ন কানাডা ডলারের একটা কোষ গড়বে বলে স্থির হয়েছে। এয়ার কানাডা জানিয়েছে, টরন্টো থেকে নিউদিল্লী সোজা বিমান চলাচলের বিষয় তাঁরা বিবেচনা করছেন। উভয় রাষ্ট্রের শিক্ষাক্ষেত্রের মধ্যে কৃষি, স্বাস্থ্য, বিমান পরিষেবা, পরিকাঠামো নির্মাণ, খনিজতেল ও তথ্যপ্রযুক্তি ইত্যাদি বিষয়ে ১৩টি মউ স্বাক্ষরিত হয়েছে।

উভয় প্রধানমন্ত্রী বিশ্বে সন্ত্রাসবাদ, বিশেষ করে হিংসাত্মক মৌলবাদ নিয়ে চিন্তা ব্যক্ত করেছেন। এর বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে প্রয়াসী হবেন বলে সহমত হয়েছেন।

উপসংহারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর এই ত্রিদেশীয় গুরুত্বপূর্ণ সফরের কয়েকটি বিষয় পাঠকদের সামনে তুলে ধরার প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে।

নরেন্দ্র মোদী বিশ্বের প্রথম শ্রেণীর গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সফর সমাপ্ত করলেন। প্রথমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, অস্ট্রেলিয়া,

কানাডার প্রধানমন্ত্রী স্টিফেন হারপারের সঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী।

বর্তমানে ফ্রান্স, জার্মানি, কানাডা। যুক্তরাজ্য সফর আগামী মে মাসের পরেই হবে। এই প্রত্যেকটি রাষ্ট্রে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শুধুমাত্র সৌজন্যের আদান প্রদানই করেননি, ভারতের 'এখানে নির্মাণ কর' মন্ত্র প্রশিক্ষিত বিক্রেতার মত ফেরি করেছেন। ভারতবর্ষে পরিবর্তনের হাওয়া জোরদার হয়েছে, নিবেশ ও শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য যা কিছু প্রয়োজন সবই মজুদ রয়েছে— কর কাঠামো ও নিয়মনীতি শিল্প-বাণিজ্যের। নিবেশের অনুকূল, প্রয়োজনে আরও সংশোধন করা হবে। একটি মাত্র জানালা দিয়ে ভারতের যে কোনো স্থানে ব্যবসা করার সমস্ত কাজকর্ম সমাধা করা সম্ভব হবে। শান্তিপূর্ণ পরিবেশ, কুশলী কর্মী, জমি এবং চাহিদা সবকিছুই রয়েছে। উৎপাদিত পণ্য বিদেশে রপ্তানি করে মুনাফা লাভও সম্ভব হবে। বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্রপ্রধান, রাজদূত নিজের রাষ্ট্রকে এই ভাবেই তুলে ধরার প্রয়াস করছেন। মোদী সেই কাজটাই করেছেন।

দ্বিতীয়ত, বিশ্বের শক্তিধর রাষ্ট্রের সঙ্গে এই বাণিজ্যিক এবং অর্থনৈতিক যোগসূত্র আগ্রাসী চীন ও ছায়াযুদ্ধকারী পাকিস্তানের মতো প্রতিবেশীকে আরও প্রকট করা সম্ভব হবে।

তৃতীয়ত, বিশ্বের উন্নতরাষ্ট্রে ভারতীয় বংশোদ্ভূতরা এক যুগান্তকারী অধ্যায় ভারতের উন্নয়নে রচনা করতে পারেন, সে বার্তাও তিনি দিয়েছেন।

চতুর্থত, প্রথমে অস্ট্রেলিয়া ভারতকে ইউরেনিয়ম রপ্তানি করতে সম্মত হয়। এবার কানাডা ভারতে আগামী পাঁচ বছর ৩.২ মিলিয়ন কিলোগ্রাম ইউরেনিয়ম রপ্তানি করবে। নরেন্দ্র মোদীর মধ্যস্থতায় এই চুক্তি ইউরেনিয়ম রপ্তানিতে কানাডার প্রতিবন্ধকতা সমাপ্ত হলো।

পঞ্চমত, ইউরোপের এই তিনটি রাষ্ট্র সাইবার সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বিশেষ ব্যবস্থা নিতে সমর্থ হয়েছে। কানাডা চীনের ভূখণ্ডে 'ঘোস্টনেট' আবিষ্কার করে, যারা ভারতের বিভিন্ন মন্ত্রকের কমপিউটার হ্যাকিং করেছিল। তথ্যপ্রযুক্তিতে অগ্রগণ্য ভারত ওইসব রাষ্ট্রের সঙ্গে একযোগে কাজ করার সুযোগ পাবে। নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, 'শিল্পায়ন শুধুমাত্র রাজনৈতিক বার্তা নয়, এটাই আমাদের আস্থা, আমাদের বিশ্বাস।' আশা করব প্রধানমন্ত্রীর প্রয়াস সার্থক হবে এবং বিশ্বের শিল্পপতিরা ভারকে বিশ্বের আধুনিকতম নির্মাণ কেন্দ্র হিসাবে গ্রহণ করবেন। ■

গো-জীবন

মীর মশার্‌রফ হোসেন

ভারতের অনেক স্থানে গো-বধ লইয়া বিশেষ আন্দোলন হইতেছে। সভা সমিতি বসিতেছে, বক্তৃতার স্রোত বহিতেছে, ইংরেজী, বাঙ্গলা সংবাদ পত্রিকায় হৃদয়গ্রাহী প্রবন্ধ সকল প্রকাশ হইতেছে, কোনো কোনো স্থানে হিন্দু মোসল্মান একত্রে এক প্রাণে এক যোগে গো-বংশ রক্ষার উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন। কোনো কোনো ইংরেজী পত্রিকায় আবার প্রতিবাদও চলিতেছে। এ সময় আর নীরব থাকা উচিত মনে করিলাম না।

আমি মোসল্মান—গো জাতির পরম শত্রু। আমি গোমাংস হজম করিতে পারি, পালিয়া পুষিয়া বড় বলদটির গলায় ছুরি বসাইতে পারি, ধর্ম্মের দোহাই দিয় দুগ্ধবতী গাভী, দুগ্ধপায়ী গোবৎসের প্রাণ সংহার করিয়া পোড়া উদর পরিপোষণ করিতে পারি, কিন্তু ন্যায়চক্ষে যাহা দেখিতেছি, যুক্তি ও কারণে যাহা পাইতেছি, তাহা কোথায় ঢাকিব? স্বাভাবিক ভাব কোন্ ভাববশে গোপন করিব? মনে এক মুখে আর হইল না। প্রিয় মৌলবী সাহেব! মার্জ্জনা করিবেন। মুন্সী সাহেব! ক্ষমা করিবেন। সুফি সাহেব! কিছু মনে করিবেন না। কি করি, জগৎ পরাধীন—কিন্তু মন স্বাধীন।...

আমাদের মধ্যে "হালাল" এবং "হারাম" দুইটি কথা আছে। হালাল গ্রহণীয়, হারাম পরিত্যাজ্য। এ কথাও স্বীকার্য্য যে— গোমাংস হালাল, খাইতে বাধা নাই। অশ্বমাংসও অন্য মতে (সাফি) হালাল। আমার মতে (হানিফি) হালালও বলিতে পারি না, স্পষ্ট হারামও বলিতে পারি না। মাঝামাঝি একটা নাম আছে (মক্‌রুহ) আবার ঐ সাফি মতে জলজন্তু মাত্রই হালাল। দৃষ্টান্তচ্ছলে এ কথা বলিতে পারি যে, রজকের পদ যতটুকু জলের মধ্যে বস্ত্র ধৌত সময় ডুবিয়া থাকে, সাফি মতের দায় দিয়া সে মনুষ্যপদটুকুও জলমধ্য হইতে কাটিয়া লইয়া ঝল্‌সা, পোড়া, সিদ্ধ, সুরুয়া, যাহার যেরূপ অভিরুচি হয়, করিয়া উদরে ফেল, কোনো চিন্তা নাই; কখনও পাপের খাতায় নাম উঠিবে না। —ইহাও শাস্ত্রের কথা। কিন্তু শাস্ত্রে এ কথা লিখা নাই যে, গোহাড় কামড়াইতেই হইবে, গোমাংস গলাধঃ করিতেই হইবে, না করিলে নরকে পচিতে হইবে। বরং যাহা অখাদ্য,—যথা বরাহ— সে বিষয় পবিত্র কোরাণশরিফে স্পষ্টভাবে বরাহ নাম উল্লেখ "খাইও না" (হারাম) লিখা আছে। খাইলে প্রধান নরক "জাহান্নাম" তাহাতেই চিরবাস করিতে হইবে, আর নিস্তার নাই। খাদ্য সম্বন্ধে বিধি আছে যে, খাওয়া যাইতে পারে, খাইতেই হইবে, গোমাংস না খাইলে মোসল্মানি থাকিবে না, মহাপাপী লইয়া নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে— এ কথা কোথাও লিখা নাই।

খাইবার অনেক আছে। ঘোড়া খাইতে পারি,—খাই না। ফড়িং ধরিয়া ঘৃতে ভাজিয়া টপাটপ্ গিলিতে পারি— শাস্ত্রের কথা, —গিলি না। গোসাপ উদরসাৎ করিতে পারি— বিধি আছে, ভয়ে তাহার নিকটও যাই না। ছাগলের মধ্যে পাঁঠাও খাদ্য, সে পাঁঠার দিকে তত ঘেঁষি না; যে ছাগীতে দুগ্ধ দেয়, তাহাকেই "আল্লাহ আক্‌বার" শুনাই। পাঁঠার সঙ্গে একেবারেই যে সম্বন্ধ নাই, তাহা বলিতে পারি না। রসনা পরিতৃপ্ত আশয়ে তাহার বংশ বৃদ্ধির ক্ষমতা রহিত করিয়া দিয়া দিব্বি মোটাসোটা চর্ব্বিদার জিনিস বানাইয়া, কোরমা কালিয়া কবাবে পেট পুরিয়া থাকি। উঁট এদেশে নাই, থাকিলেও তাহার কাছে যাওয়া যাইত না। কারণ, শরীরের গঠন দেখিয়াই পাকস্থলী ঠাণ্ডা হয়। মহিষ খাদ্য, তাহার কাছে ছুরি হাতে করিয়া যায় কে? কাজেই নিরীহ গো জাতির গলায় ছুরি বসাইতে আর এদিক্ ওদিক্ চাহি না। এত খাদ্য থাকিতেও কি গোমাংস না খাইলেই চলে না? ঘোড়া, মহিষ, বনগোরু, মেষ, ছাগল, মৃগ, খরগোস, সকলি ত চলিতে পারে? এ সকল খাইলেও ত ক্ষুধা নিবৃত্তি হয়? এত থাকিতে গোরুর মাংসে জিহ্বার জল পড়ে কেন? ইহার উত্তর কে দিবে?

গোদুগ্ধেই আমাদের জীবন। দশ মাস মায়ের উদরে বাস করিয়া জগতের মুখ দেখিতেই যেমন ক্ষুধায় কাতর হইয়া কাঁদিতে থাকি, সে সময়, —হায়! অমন কঠিন সময় কিসে আমাদের প্রাণ রক্ষা হয়? মনে মনে একটা কথা উঠিতেছে— মায়ের ত দুগ্ধ আছে? আছে। কিন্তু গো-রস মায়ের উদরে না গেলে মায়ের স্তনে দুগ্ধ পাই কৈ? মায়ের স্তনে দুগ্ধ থাকা সত্ত্বেও অনেকেই গো-রসে জীবন রক্ষা করিয়াছে। মিষ্টান্নে, পক্বান্নে সদ্যোজাত নবশিশুর প্রাণ রক্ষা হয় না, দুগ্ধই জীবের জীবন। জগতে দুগ্ধ ছাড়া এমন কোনো একটি খাদ্য নির্দ্দিষ্ট নাই যে, শুধু সেই খাদ্যটি খাইয়া জীবন ধারণ করা যায়।

গো-রসই বঙ্গের উপাদেয় খাদ্য। সুস্থ অসুস্থ শরীরে, এমন কি, প্রাণ সঞ্চার হইতে বিয়োগ পর্যন্ত দুগ্ধের প্রয়োজন। সেই দুগ্ধের মূল গোধনকে উদরসাৎ করিয়া ফেলিলে আর কি রক্ষা আছে!!...

আর একটি কথা। এই বঙ্গরাজ্যে হিন্দু মোসল্মান উভয় জাতিই প্রধান। পরস্পর এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে, ধর্ম্মে ভিন্ন, কিন্তু মর্ম্মে এবং কর্ম্মে এক— সংসারকার্য্যে ভাই না বলিয়া আর থাকিতে পারি না। আপদে বিপদে, সুখে দুঃখে সম্পদে পরস্পরের সাহায্য ভিন্ন উদ্ধার নাই। সুখ নাই, শেষ নাই, রক্ষার উপায় নাই। এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যাহাদের সঙ্গে, এমন চিরসঙ্গী যাহারা, তাহাদের মনে ব্যথা দিয়া লাভ কি?

ধর্ম্মে আঘাত লাগে না, গোমাংস পরিত্যাগ করিলে ঘরকন্নারও ব্যাঘাত জন্মে না। উন্নতির পথেও কাঁটা পড়ে না। প্রাণের হানিও বোধ হয়— হয় না। এ অবস্থায় গো হিংসা পরিত্যাগ করিলে হানি কি? পরিত্যাগে নিজের কোনো ক্ষতি নাই, অথচ চিরসহযোগী ভ্রাতার মনরক্ষা, ধর্ম্মরক্ষা, আর যাহা রক্ষা, তারা বার বার বলিব না। যাহাতে সকল দিক্ রক্ষা হয়, সে ত্যাগে ক্ষতি কি?

(সাহিত্য সাধক চরিতমালা হইতে গৃহীত)

ভারতে গো-হত্যা বন্ধের চেষ্টা নতুন নয়

দেবব্রত চৌধুরী

সম্প্রতি মহারাষ্ট্রে গো-হত্যা ও গো-মাংস ভক্ষণের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে, তারজন্য মেকি সেকুলারবাদীরা তারস্বরে চিৎকার শুরু করে দিয়েছে— মানুষের খ্যাদ্যাভাসের ওপর হস্তক্ষেপ, হিটলারপন্থীদের উত্থান ইত্যাদি।

ভারতবর্ষে হিন্দুধর্মে দেব-দেবীর সঙ্গে পশুপাখিরা সমভাবে পূজিত। হিন্দুধর্মের সমস্ত দেব-দেবীর সঙ্গে কোনো না কোনো এক পশু বা পক্ষীকে আমরা দেখতে পাই। তদুপরি ভারতবাসী গোরুকে গো-মাতা হিসাবে পূজা করে। রাজস্থানে, গুজরাটে, মধ্যপ্রদেশে এখনও হিন্দুরা কোনো শুভকাজে যাওয়ার আগে গোরুকে প্রণাম করে মুখে রুটি দিয়ে যাত্রা শুরু করে। হাজার বৎসর আগে মুসলমান নবাবরাও বুঝেছিলেন যে, গোরুকে হিন্দুরা খুব ভক্তি

করে। তাই দেশে সম্প্রীতি বজায় রাখতে হলে বা সুস্থ শাসন বজায় রাখতে হলে হিন্দুদের আরাধ্য পশু গো-মাতাকে হত্যা করা বন্ধ করতে হবে। ইতিহাস থেকে জানা যায়, মুসলমান শাসনকর্তারা বহুরকম চেষ্টা করেছে, হিন্দুদের মন জয় করার। মোগল সম্রাট বাবর ভারতবর্ষে গো-হত্যা বন্ধ করার ফতোয়া জারি করেছিলেন— তিনি তাঁর ছেলে হুমায়ূনকে বলেছিলেন সে যেন এই নীতি বজায় রাখে। এও জানা গেছে সম্রাট আকবর, জাহাঙ্গীর, আহমেদ সাহ তাঁদের রাজত্বকালে ভারতবর্ষে গো-হত্যা বন্ধ করার আদেশ দিয়েছিলেন। (সূত্র : হিন্দু রাষ্ট্র, কাউ অ্যান্ড মুসলিমস্ পার্ট-1। লেখক ইরফান ইঞ্জিনিয়ার। (মার্চ ১৬-৩১, ২০১৫ সেকুলার প্রসপেক্টিভ)। এই জার্নালে জানা যায় মহীশূরের নবাব হায়দার আলি গো-হত্যা শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে ঘোষণা করেন। কয়েক বৎসর আগে এশিয়াটিক সোসাইটির বুলেটিনে ছবি দিয়ে প্রচার করা হয়েছিল অযোধ্যার নবাব ওয়াজির সাহ হুকুম দিয়েছিলেন যে, ঈদের আগে মুসলমানদের গোশালায় কত গোরু আছে তার হিসাব দিতে হবে। ইদের পরে যদি গোরুর সংখ্যা কমে যায় তবে গোপালকের শাস্তি হবে।

মহাত্মা গান্ধী তাঁর অসহযোগ আন্দোলন এবং খিলাফত আন্দোলনের সময় শওকত আলি, মহম্মদ আলি মুসলমান সম্প্রদায়ের কাছে আবেদন করেন গো-হত্যা বন্ধ করার জন্য এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের কাছে ফতোয়া জারি করেন তাঁরা যেন গো-মাংস ভক্ষণ থেকে বিরত থাকেন। কারণ দেশকে বিদেশি শাসন থেকে মুক্ত করতে হলে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি দৃঢ় করতে হবে। এইসব কারণেই মহাত্মা গান্ধী খিলাফত আন্দোলন সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু কিছু ব্যবসাদার তাদের ট্যানারি ব্যবসা চালু রাখার জন্য গান্ধীজীর ও আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের আন্দোলন বানচাল করার জন্য সবরকম চাল চালতে লাগলে এ ব্যাপারে মুসলমান কুরেশি সম্প্রদায় ও কিছু অধার্মিক হিন্দু সমর্থন করে। বৃটিশরা হিন্দু-মুসলমান মিলনের চেষ্টা বানচাল করার জন্য এফ আই সি সি আই এবং সি আই আই-কে উস্কে দিতে লাগলো। বৃটিশরা যেন তেন প্রকারে ডিভাইড অ্যান্ড রুল প্রয়োগের চেষ্টা চালাতে লাগল। বড় বড় ব্যবসায়ীরা জানতো ভারতে গোরু ও মহিষের চামড়া সস্তা। পৃথিবীব্যাপী চামড়ার জুতা ও গ্লাভস-এর ব্যবসা খুব লাভজনক। এমনকী কাপড় মিলে চামড়া এক প্রয়োজনীয় বস্তু। কাপড় বোনার জন্য তাঁতে যে মাকু লাগে তাকে চালাতে হলে চামড়া লাগবেই। আবার মেসিনগুলি চালাতে গেলে বড় বড় চামড়ার বেল্ট লাগে, ইলেকট্রিক মোটর চালাতে চামড়া লাগে। তাই ট্যানারি ব্যবসা চালু রাখতেই হবে। সুতরাং গোহত্যা বন্ধ হয়ে গেলে এসব কলকারখানা বন্ধ হয়ে যাবে। তাতে বৃটিশ কোম্পানিগুলির ব্যাপক ক্ষতি হবে।

হিন্দুনেতা বীর সাভারকরও এক জায়গায় লিখেছেন— 'গোরু ও মহিষ ভারতীয় সমাজে এক প্রয়োজনীয় জীব, অনেকটা অশ্বত্থ ও কলা গাছের মতন পবিত্র। বাস্তববাদী হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নেতারা গোহত্যা বন্ধ করার চেষ্টা করছেন।'

মধ্য এশিয়া ভ্রমণকালে এই প্রতিবেদককে সেখানে মুসলমান লোকজন বলেছিলেন— আমাদের দেশে ঘাস (তৃণ) হয় না, গোরু থাকবে কি করে এদেশে? আমাদের গোরু খাওয়া শিখিয়েছে তো ভারতীয়রা, কারণ ওদের দেশে প্রচুর গোরু হয়।

গোপালন এবং আমাদের অর্থব্যবস্থা

সুতপা বসাক ভড়

ভারতীয় সংস্কৃতিতে গোবংশকে পুজো করা হয়ে থাকে। কারণ গো-সম্পদ, ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ এই চারটি পুরুষার্থ রক্ষার ক্ষেত্রে সহায়ক। গোরু মাঠে চরে ঘাস খায় এবং ওই ঘাসকে গোবরে রূপান্তরিত করে। গোবর মাটির উর্বরতা বজায় রাখতে সাহায্য করে— এ হলো ধর্ম। গাভি দুধ দেয় ও বাছুরের জন্ম দেয়। বলদ বড় হয়ে কৃষিকার্যে সহায়তা করে— এ হলো অর্থ। গোরুর দুধে solid non-fat-এর মাত্রা বেশি থাকার জন্য মানুষের স্বাস্থ্য ও বিশেষ করে বুদ্ধির বিকাশ হয়— এ হলো কাম। গোরুর স্পর্শমাত্র মানুষের ঈশ্বরের সম্পর্ক অনুভূত হয়— এ হলো মোক্ষ। এইভাবে গো-জাতির মাধ্যমে চার পুরুষার্থ লাভ হয়— এই বিশ্বাস আমাদের আছে। হিন্দু সংস্কৃতিতে গো-সংরক্ষণ অন্ধবিশ্বাসের জন্য নয়, বরং এর উপযোগিতার জন্য করা হয়ে থাকে।

গত ৫০ বছরে আমাদের দেশে গো-নির্ভর অর্থব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। গো-চারণের জমি বিলুপ্তপ্রায় হয়ে চলেছে, অতীতে গোরু সারদিন মাঠে চরে পেটভরে ঘাস খেত। এদের জন্য আলাদা করে খাদ্যবাবদ বেশি খরচ করতে হতো না। গোরুর গোবর থেকে তৈরি ঘুঁটে রান্নার জ্বালানির কাজে আসত এবং গোবর থেকে সার তৈরি হোত। সেই সার জমির উর্বরতা বজায় রাখতে সাহায্য করত। ধীরে ধীরে গো-চারণের স্থানটুকু মানুষ ছিনিয়ে নিয়েছে। প্রায় শুধুমাত্র ভুসার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে গো-পালন। গোচারণের অভাবে গোবরের যোগানও কমে আসছে। যেটুকু গোবর পাওয়া যাচ্ছে, তা জমির উর্বরতা বজায় রাখার পক্ষে যথেষ্ট নয়, সুতরাং কৃষকেরা বাধ্য হয়ে রাসায়নিক সারের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। এতে গোপালনের যে ব্যাপক লাভ ছিল তা না পাওয়ায় বর্তমানে কৃষকদের কাছে গোরু রাখার অনিবার্যতা দিনে দিনে কমে আসছে। এর সঙ্গে ট্রাক্টরের আবির্ভাব বলদের প্রয়োজনীয়তাকে শেষ করে দিচ্ছে।

গোরক্ষা এবং গোপালনকে উৎসাহ দিতে হলে আর্থিক নীতির সংশোধন জরুরি। সব রাজ্যসরকারের পক্ষ থেকে প্রতিটি রাজ্যে যথেষ্ট পরিমাণ গোচারণ ভূমির ব্যবস্থা রাখতে হবে। এখনও পর্যন্ত রাসায়নিক সারের জন্য ভরতুকি দেওয়া হয়ে থাকে। ষাটের দশকে দেশের সামনে খাদ্যান্ন উৎপাদন একটি বড় সমস্যার রূপ নিয়েছিল। ওই পরিস্থিতিতে যতশীঘ্র সম্ভব খাদ্যান্ন উৎপাদন বৃদ্ধিই ছিল আমাদের লক্ষ্য। ওইসময় রাসায়নিক সারের ওপর ভরতুকি দিয়ে তার ব্যবহার জনপ্রিয় করার চেষ্টা করা হয়েছিল। ফলস্বরূপ, আমরা আকাঙ্ক্ষিত খাদ্যান্ন উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছিলাম। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে যথেচ্ছভাবে রাসায়নিক সার ব্যবহারের ফলে আমাদের জমির উর্বরতা নষ্ট হতে চলেছে। অথচ ভরতুকি বন্ধ হবার সম্ভাবনাও নেই। ওইসব রাসায়নিক সারের পরিবর্তে যদি জৈব সারের ওপর ভরতুকি দেওয়া হয়, তবে গোবরের উৎপাদন অপেক্ষাকৃত বাড়বে। গোবরের মতো জৈবসার প্রয়োগ করলে জমির অনুর্বরতা দূর হবে। কৃষকদের দীর্ঘমেয়াদি লাভ হবে। এইভাবে কৃষক গোবরের উপযোগিতা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হলে গো-পালনে তারা উৎসাহিত হবে।

বর্তমানে রাজস্থান-সহ বেশ কিছু রাজ্যে দেশি গোরুর গোমূত্র থেকে দুরারোগ্য রোগের ওষুধ তৈরি হচ্ছে। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের এই বিশেষ দিকটি নিয়ে যথেষ্ট গবেষণার প্রয়োজন আছে। সরকারি অনুদান পেলে গোমূত্রের উপযোগিতা ও বিপণন দুয়েরই প্রচার-প্রসার সম্ভব। সেক্ষেত্রে গো-পালন কৃষক ও পশুপালক উভয়ের কাছেই লাভদায়ক হিসাবে গণ্য হবে।

গোরু ও মোষের দুধের তুলনাত্মক বিচার করলে দেখা যায়, মোষের দুধে ফ্যাট বেশি থাকায় বেশি জনপ্রিয়, অথচ গোরুর দুধের গুণবত্তা অনেক বেশি। স্বাস্থ্য ও বুদ্ধির বিকাশে গোরুর দুধ অনবদ্য। গোপালনকে লাভান্বিত করার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে গোদুগ্ধের গুণগুলি বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরা উচিত। শুধুমাত্র গোরুর দুধই নয়, গো-দুগ্ধজাত নানান খাদ্যপদার্থ যেমন পনীর, রকমারি পুষ্টিকর মিষ্টির গুণবত্তা সম্বন্ধেও জনসাধারণকে জানাতে হবে। তবেই তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে গো-দুগ্ধজাত খাদ্যপদার্থের প্রতি আকৃষ্ট হবে। এর ফলে গো-দুগ্ধের বিক্রি নিশ্চিতভাবে বাড়বে।

কৃষকদের কাছে বলদ পালন একটি সমস্যা। কৃষিজমিতে ট্রাক্টরের ব্যবহার প্রাথমিকতা পাচ্ছে, তার ওপর বিদ্যুৎ ও ডিজেলের ওপর ভরতুকির ফলে কৃষক ওইদিকেই বেশি ঝুঁকছে।

অথচ দেখা গেছে যে, যথেচ্ছ ট্রাক্টরের ব্যবহার কৃষিজমির জন্য মোটেই দীর্ঘমেয়াদি সুফল দিচ্ছে না। সেক্ষেত্রে দেশি বলদ সংরক্ষণ করা এবং ট্রাক্টরের সঙ্গে সঙ্গে বলদকে যদি কৃষিকার্যে লাগানো যায়, তাহলে জ্বালানি, জমি দুয়েরই লাভ। সরকার জৈব সারের ওপর ভরতুকি দিলে বলদ পালনের চাপ কৃষকদের ওপর থেকে অনেকটাই কমবে।

সর্বোপরি, ভারতের মতো কৃষিপ্রধান দেশে কৃষি এবং গোপালনের ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। অতীতে কৃষিকাজ এবং গোপালন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ছিল। অতীতের ওই ধারণাকে ভিত্তি করে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির মাধ্যমে আমাদের নতুন করে ভাবতে হবে। কৃষকেরা যদি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার সুফল পেতে শুরু করে তবে তারা গোপালন এবং গোরক্ষায় আগ্রহী হবে।

গো-সম্পদ ও উত্তরবঙ্গ

গৌতম কুমার সরকার

উত্তরবঙ্গ গো-সম্পদে সমৃদ্ধ। এখনও এখানকার গ্রামাঞ্চলে দেশি প্রজাতির গো-বংশ বা গো-সম্পদ যে পরিমাণে আছে তার মাধ্যমে প্রতিটি গৃহে ধনবর্ষা হবার সম্ভাবনা প্রবল। পৃথিবীতে বাঘ, সিংহ-সহ অনেক জন্তু-জানোয়ার আছে যার আর্থিক মূল্য লক্ষ লক্ষ টাকা, কিন্তু তাদেরকে আমরা মা বলি না। একমাত্র গো-সম্পদ যাকে আমরা গো-মাতা বলি। শাস্ত্রে বলা হয়েছে, সমস্ত দেবী-দেবতা বাস করে গো-মাতার শরীরে। গো-ময় অর্থাৎ গোবরে লক্ষ্মী বা আর্থিক সম্পদ বিরাজমান। অন্য পশু-পাখি এবং মানুষের মলকে বিভিন্ন নাম দেওয়া হয়েছে। একমাত্র গো-মাতার মলকে গো-বর অর্থাৎ গো-মাতার আশীর্বাদ বলা হয়েছে। গো-মাতা জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত গোবর এবং গো-মূত্র দান করে। এই গোবর এবং গো-মূত্রকে সামান্য প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জীবনদায়ী ওষুধে পরিণত করে মানুষ সচ্ছল, সমৃদ্ধ, আনন্দময় স্বাভিমানী হতে পারে। গোবর থেকে গোবর গ্যাস হয়— সেই গোবরে ভালো ভার্মি কম্পোস্ট বা কেঁচো সার হয়। গোবর এবং বিভিন্ন আবর্জনা বা ঘরবাড়ি ঝাঁট দেবার পর জমা জঞ্জাল দিয়ে জৈবিক সার তৈরি হয়।

গোবর থেকে প্রসাধন সামগ্রী দন্তমাজন, ধূপ, সাবান সহ অনেক কিছু হয়। ৪ জনের পরিবার ১টি গাই, ১টি বাছুর থাকলে একটি ছোট গোবর গ্যাস প্লান্ট তৈরি করা যায়। পরিবারের রান্নার পর্যাপ্ত গ্যাস যার দাম ৫০০ টাকা। গ্যাস হবার পর যে গোবর বেরিয়ে আসবে তাতে কেঁচো সার তৈরি করা যায়। দিনে ৭ কিলোগ্রাম গোবর হলে কেঁচো সার খুচরা ১০ টাকা, পাইকারি ৫/৬ টাকা। দিনে ৬০ থেকে ৭০ টাকা অর্থাৎ মাসে ১৮০০/২১০০ টাকা আয় করা যায়।

পাতন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গোমূত্র থেকে অর্ক তৈরি করে ১৫০/১৬০ টাকা কিলোগ্রাম দিনে ৩ কিলোগ্রাম হলে ৪৫০ টাকা, মাসে ১৩৫০০ টাকা আয় হবে। প্রথম দিকে এককালীন কিছু খরচ করে পাত্র কিনতে হবে। মাসে ৫০০ + ১৮০০ + ১৩৫০০ = ১৫৮০০। নিজের শ্রম দিনে ১০০ টাকা অর্থাৎ মাসে ৩০০০ টাকা। গো-খাদ্য ৩০০০—৬০০০ টাকা। অর্থাৎ ১৫৮০০—৬০০০=৯৮০০ টাকা প্রতি মাসে ১টি গাই + ১টি বাছুর থেকে ১ জনের পরিশ্রমে ৯৮০০। আরও ৮০০ টাকা বাদ দিলে ৯০০০ টাকা আয় করতে পারে, সঙ্গে অন্য কাজ করা যাবে।

এর উপর বছরে ৬/৭ মাস প্রতিদিন ৩ কিলোগ্রাম করে দুধ যার দাম ৩৯০ টাকা অর্থাৎ মাসে ২৭০০ টাকা। বছরে ১টি বাছুর বোনাস। যেহেতু দুধ ৭ মাস পাওয়া যায় সেটাকে গড় করলে কম করে মাসে ১৫০০ টাকা হবে। অর্থাৎ গোবর থেকে ২৩০০, গোমূত্র থেকে ১৩৫০০, দুধ থেকে ১৫০০ মোট ১৭৩০০, খরচ বাবদ বাদ ৬৩০০ = ১১০০০ টাকা নিট আয়। ১টি বাছুর অতিরিক্ত।

যারা অর্ক বানাতে পারবেন না তারা সরল পদ্ধতিতে ১টি মাত্র মাটির পাত্র সম্বল করে ২০ লিটার গোমূত্র, ৫ কিলোগ্রাম নিমপাতা, ১টা তামাক পাতা দিয়ে মাটিতে গর্ত করে ১ মাস রেখে কীট নিয়ন্ত্রক তৈরি হবে যার দাম ৪০/৫০ টাকা কিলোগ্রাম। গড়ে ৫ লিটার মূত্র দিনে হলে মাসে ১৫০ লিটার × ৪০ টাকা ৬০০০ টাকা প্রতি মাস।

জীবিত গো-মাতার সাধারণ হিসাব দেওয়া হলো। মৃত গোরুর সিং থেকে মাত্র ৬ মাসের বিনা পয়সার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ১ একর জমিকে উর্বরা করা যায়, যার ফলে রোগমুক্ত এবং বেশি পরিমাণ ফসল পাওয়া যায়।

গো-আধারিত কৃষির ফলে পরিবেশ দূষণমুক্ত (পাওয়ার টিলার/ ট্রাক্টরের ডিজেলের ধোঁয়া) হয়। বিদেশি মুদ্রা সাশ্রয় (ডিজেল আমদানির জন্য) হয়। জমির স্বাভাবিক মিত্র কেঁচোর ধ্বংস থেকে রক্ষা পায়। কারণ ট্রাক্টর চাষে জমির কেঁচো কাটা পড়ে ফলে জমির মাটি শক্ত হয়ে যায় সেইজন্য সেচের জল বেশি পরিমাণ প্রয়োজন হয়।

একদিকে প্রত্যক্ষ আর্থিক লাভ অন্যদিকে দেশীয় মুদ্রা বাঁচানো, পরিবেশ শুদ্ধিকরণ— বিষের হাত থেকে রক্ষাই অর্থাৎ চিকিৎসার খরচ হাত থেকে বাঁচা। আর্থিক, সামাজিক দিক দিয়ে উন্নতি, ক্ষুধামুক্ত, রোগমুক্ত, ঋণমুক্ত স্বাবলম্বী, স্বাভিমানী উত্তরবঙ্গ সবার সামনে আদর্শ হতে পারে। সামান্য প্রশিক্ষণ, একটু মানসিক প্রস্তুতি, সামাজিক দায়িত্ব বোধ থেকে এটা হতে পারে।

চা-বাগান এবং গো-সম্পদ :

একটি বাগানে প্রতি বছর রাসায়নিক সার, কীটনাশক ব্যাবহার করে যে পাতা উৎপন্ন হয় সেটা বিদেশিরা কিনতে প্রস্তুত নয়। উপরন্তু চা শ্রমিকদের জীবনে অন্ধকার প্রতিদিন একটু একটু করে ঘনীভূত হচ্ছে।

যদি মালিক ২০০ শ্রমিককে বোনাস হিসাবে বা বিনা সুদে একটি গাভি দেবার ব্যবস্থা করেন সঙ্গে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কেঁচো চাষের ব্যবস্থা করেন, অন্যদিকে গো-মূত্র-নিমপাতা সহ বিভিন্ন পদ্ধতিতে কীট-নিয়ন্ত্রক তৈরি করে, তাহলে শ্রমিকরা বাগান মালিককে কেঁচো সার এবং কীট-নিয়ন্ত্রক বিক্রি করতে পারবে। যেহেতু গাভি মালিক দিয়েছে সেহেতু লাভের টাকা থেকে কিস্তিতে মালিক টাকা ফেরত পাবে। রাসায়নিক সার এবং কীটনাশক কেনার টাকা বাঁচবে। চা রপ্তানি করে বেশি পয়সা আসবে। পরিবেশ দূষণমুক্ত হবে, শ্রমিক রোগমুক্ত হবে। কম করে ১টি পরিবার ৫ কিলোগ্রাম কেঁচোসার ২৫.০০, ৫ লিটার কীটনিয়ন্ত্রণ ১৫০.০০ অর্থাৎ ১৭৫.০০ প্রতিদিন আয় অর্থাৎ মাসে ৫২৫০ টাকার সঙ্গে দুধ ধরলে গড়ে ১০০০ টাকা অর্থাৎ শ্রমিকের ৮ ঘণ্টার মজুরির সমান আয় ২ ঘণ্টা পরিশ্রম করে পাবে। বছরে ১টা বাছুর সেটা অতিরিক্ত বোনাস।

দুধ/দই/ঘি পর্যাপ্ত হবে। তার জন্য নেশামুক্তির রাস্তা পরিষ্কার হবে। রোগ, শোক, অশিক্ষা, অনাহার, নেশার পরিবর্তে সুখী, সমৃদ্ধ, উজ্জ্বল, স্বচ্ছল, সবুজ বাগান উত্তরবঙ্গের পালকে নতুন সংযোজন হবে।

চিঠিপত্র

আলুচাষির প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর নজর দেওয়া উচিত

আমাদের দেশে যে আলু আমরা উৎপাদন করি তার Water Contain 80-85%। এই আলু হতে পাউডার তৈরি করা যাবে কিন্তু খরচ পোষাবে না এবং এই আলু এত তাড়াতাড়ি পচতে পারে, তাই বিদেশে রপ্তানি করাও খুব ঝুঁকি।

আলুচাষির এতবড় বিপদের মূল কারণ কী? আমরা পশ্চিমবঙ্গবাসী গত বছর ১৮-২২ টাকার মধ্যে সারা বছর আলু কিনে খেয়েছি। কিন্তু আমাদের দেশের অন্যান্য রাজ্যের অধিবাসীরা ৪০-৬০ টাকা দরে আলু কিনে সারা বছর খেয়েছেন। এর কারণ হচ্ছে, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী আমাদের সুবিধার জন্য চেক পোস্টে আলুর গাড়ি আটকে, রাজ্যের বাইরে আলু যাওয়া বন্ধ করে দিলেন শুধু মাত্র কলকাতার মানুষের স্বার্থে। কলকাতায় এনে বহু লরি আলু পচিয়ে দিয়েছিলেন। তবু সহজ পথে ভিন্ রাজ্যে আলু যেতে দেননি। তা হলে কি ধরে নিতে হবে— বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড রাজ্যের ভাইয়েরা আলু না খেয়ে ছিলেন? তা কিন্তু নয়, চোরাপথে আলু গেছে এবং লরি পিছু বখরা ৩০-৪০ হাজার দুইভাগে ভাগ হয়ে যাবার পর আলু ভিন্ রাজ্যে ঢুকতে পেরেছে এবং সেখানকার অধিবাসীরা ৪০-৬০ টাকা দরে আলু কিনতে পেরেছেন।

কিন্তু এর জন্য ভিন্ রাজ্যের পিঁয়াজ, মাছ, ডিম ইত্যাদি আসা বন্ধ হয়নি। ঐসব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা এতটা অমানবিক হতে পারেননি। যদি তাঁরা বন্ধ করতেন কী ভয়ানক বিপদে যে আমরা পড়তাম তা খুব সহজেই অনুমেয়। ওই বছর পাকিস্তান এবং আফগানিস্তানে আলু চাষে বিপর্যয় ঘটেছিল। পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ থেকে পাকিস্তানের দূরত্ব খুব বেশি নয়। প্রচুর আলু ঐসব দেশে গেছিল। কিন্তু তার জন্য মোদীজী কোনোরূপ বাধানিষেধ আরোপ করেননি। বরঞ্চ সর্বনিম্ন দাম বেঁধে দেওয়াতে প্রচুর বিদেশি মুদ্রা আমাদের দেশ অর্জন করেছিল। এবছর কিন্তু ওই রাস্তা বন্ধ, কেননা পাকিস্তানে ভাল আলু উৎপন্ন হয়েছে।

ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড, বিহার রাজ্যে আলু সরবরাহ করে ফি বছর পশ্চিমবঙ্গের চাষিরা লাভ পান, বরং বলা ভাল এত ব্যাপক চাষ ওই জন্যই হয়। ওই সমস্ত রাজ্যেও আলুর চাষ হয়। কিন্তু তা এতই সামান্য যে তা নিজেদের ১ মাসও চলে না। লোডিং সময়ে ওই সমস্ত রাজ্যের ব্যবসায়ীরা আলু কিনে তাদের রাজ্যে যে ক'টি হিমঘর আছে তাতে যতটা পারেন সংরক্ষণ করেন এবং বাকিটা সারা বছর ধরে এখান থেকেই আলু নিয়ে যান। কিন্তু এ বছর আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর দৌলতে ওখানের খুচরো বাজারে আলু ৪০-৬০ টাকা দরে কিনে খেতে হয়েছে অনেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ভোগ করে। তাই এবছর সেখানের রাজ্য সরকার (বিশেষ করে ওড়িশা) চাষিদের ভরতুকি দিয়ে ব্যাপক হারে আলু চাষ করিয়েছে--- যাতে রাজ্যের অধিবাসীরা আলুর জন্য কষ্টে না থাকেন। ফলে যে আলু উৎপাদন হয়েছে তা দিয়ে তাদের রাজ্যের হিমঘর পূর্ণ হয়েও ১ মাস খাবে। এর পর যখন হিমঘর খুলবে তখন ওই রাজ্যে আলু যাওয়ার গতি অত্যন্ত শ্লথ থাকবে— অন্তত ৩/৪ মাস। এমনিভাবে দেশের সর্বত্রই আলু চাষ বেড়ে গেছে। যে গুজরাট আগ্রা থেকে আলু এনে হিমঘর পূর্ণ করে, এখন তাদের নিজেদের রাজ্যের আলুতেই হিমঘর পূর্ণ হয়ে ১০-১৫ লক্ষ প্যাকেট বাড়তি থেকে গেছে।

সমাধানের একটাই রাস্তা। অর্ধেক আলুকে যদি আরব সাগরে ফেলে দেওয়া যায়। নচেৎ, এই রাজ্য সরকারকে পশ্চিমবঙ্গের চাষিরা আরব সাগরে ফেলে দেবেন— একথা হলফ করে বলতে পারি।

—মনতোষ বসু,
ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘ, জেলা কার্যকরী সভাপতি, বাঁকুড়া।

ব্যাসদেবের অষ্টাদশ প্রীতি

ধরণীধর মণ্ডল তাঁর নিবন্ধে, (স্বস্তিকা, ১.১২.১৪), বলেছেন— 'অষ্টাদশ' (১৮) সংখ্যাটি ব্যাসদেবের নিকট অত্যন্ত 'শুভ' ছিল। মহাভারতের আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত উক্ত সংখ্যাটির সার্থক প্রয়োগ তাঁর 'অষ্টাদশ প্রীতি'র পরিচয় বহন করে। যেমন, মহাভারতের প্রথম শ্লোকটির উভয় পঙ্‌ক্তিরই অক্ষরমালা অষ্টাদশ; গীতার অধ্যায় সংখ্যা 'অষ্টাদশ' এবং গীতার ১ম শ্লোকের এবং ১৮ শ অধ্যায়ের শেষ শ্লোকের শেষ পঙ্‌ক্তির অক্ষরমাত্রাও 'অষ্টাদশ'। আবার, মহাভারতের মোট পর্বসংখ্যা ১৮; কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ চলেছে ১৮ দিন; যুদ্ধে সমবেত সৈন্যসংখ্যা '১৮' অক্ষৌহিনী; যুদ্ধজয়ের পর (পঞ্চ) পাণ্ডবের রাজত্বকাল ছিল 'দ্বি-অষ্টাদশ' বৎসর ইত্যাদি ইত্যাদি। নিবন্ধের উপসংহারে শ্রীমণ্ডল বলেছেন, উপরোক্ত ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মহাকাব্য রচনা একমাত্র মহা তপস্বীর তপঃ প্রভাবেই সম্ভব। এখানে একটি কথা— '১৮' সংখ্যাটি কেন ব্যাসদেবের নিকট 'শুভ' ছিল, নিবন্ধে তার কোনো ব্যাখ্যা মিলল না। আর, তাঁর 'অষ্টাদশ-সংখ্যা প্রীতি'র কারণেই যদি ব্যাসদেব যেখানে যেমন সঙ্গত মনে করেছেন সেখানে '১৮' সংখ্যাটি বা সেটির ভগ্নাঙ্ক বা গুণীতক প্রয়োগ করে থাকেন, তাহলে তো বলতে হয় মহাভারতে উল্লেখিত '১৮' দিনের যুদ্ধ, '১৮' অক্ষৌহিনী সৈন্য ইত্যাদি সংখ্যাগুলি ব্যাসদেবের কল্পনা-প্রসূত; প্রকৃত সংখ্যা নয়।

পরিশেষে, আর একটি কথা শ্রীমণ্ডল বলেছেন— 'মহারাজ ভরতের নামানুসারে এদেশের নাম ভারতবর্ষ'। সেই ভরতবংশই তাঁর অধস্তন 'অষ্টাদশতম' প্রজন্মেই সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেল। মহারাজ ভরতের নামানুসারে 'ভারতবর্ষ' নামটি এসেছে, তা ঠিক বলেই জানি। কিন্তু, তিনি কোন 'ভরত'? আমরা সাধারণত জানি, তিনি দুষ্মন্ত শকুন্তলার পুত্র, ভরত। আবার, শ্রীমদ্ভাগবতের জড়ভরতের উপাখ্যানে দেখা যায়, জড়ভরত-এর নাম হতে 'ভারতবর্ষ' নামের প্রচলন--- (দ্রঃ 'মহাভারতের সমাজ'— সুখময় শাস্ত্রী সপ্ততীর্থ-পৃ. ১)।

—বিমলেন্দু ঘোষ,
পর্ণশ্রী পল্লী, কলকাতা-৬০।

লীগের অঘোষিত অনুসরণ!

ড. কৃষ্ণকান্ত সরকার

এখন উন্নয়নে আমরা আত্মহারা। অবশ্যই দরকার উন্নয়ন। কিন্তু ইতিহাস ভাবায় উন্নয়নের ফলভোগ কারা করবে? কথায় আছে Rome was not built in a day। খৃষ্টপূর্ব দুনিয়ায় রোম তার জাঁকজমকপূর্ণ সভ্যতার জন্য ছিল জগদ্বিখ্যাত। কতশত বছর ধরে যে প্যাগান জাতি কত শ্রম, অর্থব্যয়, ধৈর্য ও বুদ্ধি খরচ করে রোম সভ্যতা গড়ে তুলেছিল তা বলে শেষ করা যাবে না। রোমের মূর্তিপূজারিরা সিনেট হল, দেবদেবীর মন্দির প্রভৃতি যে সভ্যতা, যে যে উন্নয়ন তারা করেছিল তা কি তাদের ভোগে লেগেছে? তৃতীয় শতাব্দীতে প্রথম খৃষ্টান সম্রাট কন্‌স্টেনটাইন রোম দখল করে মূর্তিপূজারিদের সম্রাট লিসিলিয়াসকে হত্যা করে। তারপর সম্রাটের নির্দেশে মন্দিরের ধনসম্পত্তি লুঠ চলল। এই কাজে সম্রাট কর্মচারী নিয়োগ করলেন। মন্দিরে মূর্তি বসানো বন্ধ করার নির্দেশ জারি হলো। কোথাও নতুন মূর্তি বসানো আর হলো না। রোমের মন্দিরের দরজা প্রভৃতি খুলে নিয়ে গিয়ে কন্‌স্টেন্টাইন শহর তৈরি হতে থাকল। একদিকে মন্দির ধ্বংস অপরদিকে রাজ্যের যেখানে দরকার সেখানেই গির্জা ও হলঘর তৈরি করা হলো। একদিকে অসহায় পরাধীন মূর্তিপূজকদের উপর শাসকের চাপ, অপর দিকে সম্রাটের মিশনারি পৃষ্ঠপোষকতায় প্যাগনদের খৃষ্টত্বে দীক্ষিত করার কাজকর্ম চলতে থাকল। এতকাল যে খৃষ্টানরা ছিল সাম্রাজ্যে এক ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু, প্যাগনদের খৃষ্টত্বকরণ ও তাদের বংশ বিস্তারের ফলে তিন শ' বছরের মধ্যে প্যাগান ইউরোপ খৃষ্টান ইউরোপ হয়ে গেল। একথা আমরা জানতে পারি A. H. M. Jones লিখিত Constantine And the Conversion of Europe বই পড়ে (যদিও এই ঐতিহাসিকের লেখা অনেক বই-ই আলিপুর ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে আছে, কিন্তু এই বইখানি কেন যে নেই তার কারণ অজানা। হয় এই বই-এর গুরুত্ব সম্বন্ধে সংগ্রহকারীরা অবহিত ছিলেন না অথবা এই বই পড়ে 'ধর্মান্তরকরণ' বিষয়ে হিন্দুর বোধোদয় হোক এটা স্বার্থগোষ্ঠীর নীতিবহির্ভূত ছিল। একথা বলা হলো এইজন্য যে ভারতে হিন্দুদেরই খৃষ্টান ও মুসলমানকরণ চলছে দু-হাজার বছর ধরে। এই প্রক্রিয়া দ্বারা ব্যক্তি, সমাজ, দেশ, রাষ্ট্রচরিত্র এমনকী মানবজাতিরই পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে ও হচ্ছে। যে সোসিওলজি এখানে আমাদের শেখানো হয় তাতে সমাজ পরিবর্তনে ধর্মান্তরকরণের ভূমিকা শেখানো হয় না। শাসকগোষ্ঠীর স্বার্থেই ধর্মান্তকরণ সম্ভবত পড়ানো ও গবেষণা হয় না)।

প্যাগানরা রোমসভ্যতা সৃষ্টি করল। ভোগ করল খৃষ্টান জাতি। হিন্দুরা পূর্ববঙ্গে বাড়িঘর, স্কুল, কলেজ বানাল শত শত বছর ধরে। ১২০৪ সালে বক্তিয়ার বাংলা দখল করার পর শুরু হয় মুসলমানিকরণ। এর আগে বাংলায় মুসলমান সমাজ ছিলই না। এই ধর্মান্তরকরণ প্রক্রিয়া হিন্দুর ধর্মে নেই। এই কাজে কত যে কৌশল, ছলাকলা হিন্দু চাষি, জেলে ও সাধারণের ছিল অজানা। পীরের পূজা শত শত বছর ধরে চালানোর শেষে তা আল্লার আজানে পরিণত হয়েছে। কিছু হিন্দুকে হাত করে সত্যনারায়ণের পাঁচালিতে লেখা হয় যেই কোরান সেই পুরাণ। কতভাবে আজও এখনও যে হিন্দুদের মগজ ধোলাই করে মুসলমান করার কাজ এই পশ্চিমবঙ্গে চলছে তা হিন্দুরা জানেই না। কারণ এ কাজে গবেষণা, প্রকাশন, পরিসংখ্যান নেই। দীর্ঘকাল ধরে মুসলমান শাসনাধীন-হিন্দু বলপ্রয়োগ, চাপ ও নানা বিভ্রান্তির শিকার হয়ে মুসলমান হতে থাকল। ১৯৪৩ সালে পূর্ববাংলার অনেক জেলায় হিন্দু সংখ্যাগুরু থেকে সংখ্যালঘু হলো। কোনটা ধর্ম আর কোনটা ধর্মের মুখোশের আড়ালে সাম্রাজ্যবাদ তা বোঝানোর উপায় আমাদের জানা নেই। যা ঘটনা এবং বাস্তব সত্য তা হলো যে সম্প্রদায় ধর্মের আড়ালে যত বেশি মানুষকে ধর্মান্তরিত করতে পেরেছে তাদেরই ততবেশি পৃথিবীর জমিতে ভোগ দখল কায়েম হয়েছে। তাই যে যে জেলায় মুসলমানরা সংখ্যাগুরু হলো সেই জেলাগুলি নিয়ে পাকিস্তান হলো ১৯৪৭ সালে এবং সেখান থেকে হিন্দুরা উদ্বাস্তু হয়ে ভারতে এসে আশ্রয় নিল। গান্ধী-নেহরুর মতো এমন হিন্দু হিতকারী আর কে আছে? এঁরা জমি দিয়ে হিন্দুদের উদ্বাস্তু করতে দ্বিধা করলেন না। কিন্তু সংখ্যালঘু বিনিময়? নৈব নৈব চ। স্বাধীনতার ৬৭ বছরের মধ্যে যে মুসলমানরা সংখ্যালঘু ছিল আজ তারা অনেক জেলায় সংখ্যাগুরু। ১৯৫২ সালে ভারতে মুসলমান ছিল শতকরা ১৯.৫ শতাংশ, এখন তা বেড়ে হয়েছে ৩০ শতাংশ।

২০১১ সালে সংখ্যালঘু রিপোর্ট অনুসারে ২৭ শতাংশ। প্রশ্ন হলো, কবে কত সাল নাগাদ পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু কমতে কমতে সংখ্যালঘু হবে? মুসলিম লীগ আজ আর নেই। মুসলিম লীগের শুভ দিন শুক্রবার। ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট শুক্রবার তারা শুভ ডাইরেক্ট অ্যাকশন শুরু করে। অনতিবিলম্বে পাকিস্তান লাভ করলো। শুভদিন শুক্রবারই নয়, শুক্রবার মুসলিম লীগের শক্তি পরীক্ষার দিন। দিদি ও তাঁর সরকারের শপথের দিনও শুক্রবার। শুধু তাই নয়, লীগ ইমাম ভাতা চালু করেনি দিদি তা করেছেন। সকলে বলছে লীগ না থেকেও আছে। ■

শ্রীচৈতন্য পরবর্তী নতুন ধারার মন্দির

বাংলার মন্দিরে মন্দিরে

চন্দ্রকোণার অযোধ্যার রঘুনাথমন্দির

ড. প্রণব রায়

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত ঐতিহাসিক শহর চন্দ্রকোণার একটি মহল্লা বা পল্লী অযোধ্যা। 'বাহান্ন বাজার তিপান্ন গলি'র শহর চন্দ্রকোণা 'ভান' রাজাদের সময় (ষোল শতক থেকে সতেরো শতক) অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী ছিল। এই স্থান ছিল 'ভান' রাজ্যের রাজধানী। ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে অঙ্কিত ফান ডেন ব্রুকের মানচিত্রে চন্দ্রকোণাকে 'চাঁদের কণা' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ওই সময় 'ভান' রাজা মিত্রসেন ও তাঁর মাতা রানী লক্ষ্মণাবতীর শাসনকাল। মিত্রসেন ছিলেন রাজা হরিনারায়ণের পুত্র। লক্ষ্মণাবতী চন্দ্রকোণার লালগড়ে গিরিধারীলাল জীউর একটি সুন্দর 'নবরত্ন' মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। যুদ্ধবিগ্রহে কালক্রমে সেটি ধ্বংস হয়ে গেলে শক্ত পাথরে খোদিত সেই মন্দিরের দীর্ঘ শিলালিপিটি অযোধ্যার বৃহৎ 'আটচালা' শৈলীর লালজীউর মন্দিরে এনে রাখা হয়। লালজীউর নতুন মন্দির সম্ভবত বর্ধমানের রাজা কীর্তিচন্দ্র (১৭০২-১৭৪০ খৃষ্টাব্দ) প্রতিষ্ঠা করেন। লালজীউর পাশে রঘুনাথজীউ উচ্চ 'শিখর' দেউল, তার সম্মুখ সংলগ্ন 'জগমোহন' ও নীচে প্রশস্ত নাটমন্দির। রঘুনাথজীউর দেউলের ঠিক উত্তরপাশে 'ভোগমণ্ডপ'। নীচে 'স্নানমঞ্চ' ও 'চারচালা' বিশাল 'তোষাখানা' বা ধনভাণ্ডার। এর চারপাশে প্রাচীরবেষ্টিত।

এটি 'ঠাকুরবাড়ি'। প্রশস্ত চত্বরের মাঝখানে নহবতখানা এবং পাশে ও নীচে থাকবার ঘর। এর পরের একটি প্রশস্ত চত্বরে পঞ্চাননের একটি 'পঞ্চরত্ন' মন্দির, একটি রাসমঞ্চ ও কয়েকটি 'চারচালা' সমাধি। পূর্বমুখী তোরণদ্বার বহির্গমন পথ।

এই সুন্দর ঠাকুরবাড়িটি দীর্ঘকাল ধরে ধ্বংস হয়ে চলেছে। এর সুবৃহৎ আটচালামন্দির একেবারে বিভিন্ন জায়গায় বিধ্বস্ত। নাটমন্দিরের ছাদ বহুকাল আগে ভেঙে গেছে। লেখকের পরিদর্শনের সময় পর্যন্ত 'ভোগমণ্ডপ' ও 'তোষাখানা' অক্ষত ছিল। 'স্নানমঞ্চ' ঠিক ছিল।

কিন্তু সর্বাপেক্ষা শোচনীয় অবস্থা রঘুনাথজীউর 'শিখর' দেউল মন্দিরের। অবহেলা-অনাদরে অযোধ্যার রঘুনাথবাড়ির ঠাকুরবাড়ির ধ্বংসলীলা যেমন চলছিল, তেমনি এই মন্দিরেরও সেই দশা হয়েছে। বর্তমান চিত্রটি রঘুনাথজীউর দেউল ও জগমোহনের মন্দিরের ধ্বংসপ্রাপ্ত রূপটি প্রকাশ করছে। কিন্তু কয়েক বছর আগে দেখা এই সুদৃশ্য মন্দিরের 'শিখর' দেউলটির সবটাই প্রায় পড়ে গেছে, শুধুমাত্র উত্তরদিকে অংশ কিছুটা আছে। 'জগমোহন'টি এখনো আছে, কিন্তু অচিরেই ভূমিসাৎ হওয়ার সম্ভাবনা। এরই নীচে নাটমন্দিরটির কথা আগেই বলা হয়েছে। প্রায় বিধ্বস্ত এই মন্দিরের দেববিগ্রহগুলি বহুকাল আগে 'ঠাকুরবাড়িবাজার' (গুড়িচাবাড়ি)-এ একটি 'পঞ্চরত্ন' মন্দিরে স্থানান্তরিত। বেশ কয়েকবছর আগে বিগ্রহগুলি অপহৃত হয়েছিল। পরে একটি পুকুর থেকে উদ্ধার করা হয় বলে জানা যায়।

'রঘুনাথবাড়ি'র লালজীউর আটচালা' শৈলীর মন্দির, রঘুনাথজীউর দেউল ও জগমোহন এই ঠাকুরবাড়ি তথা সমগ্র চন্দ্রকোণা অঞ্চলের একটি গর্ব ও অলঙ্কার ছিল। জনগণ ও সরকারি ঔদাসীন্যের ফলে এগুলির অতি শোচনীয় অবস্থা দেখলে দুঃখ হয়।

ওড়িশি 'শিখর'-শৈলীর স্থাপত্যে এক সুন্দর নিদর্শন ছিল এই মন্দির— 'বিমান' বা 'বড়দেউল', সম্মুখ সংলগ্ন 'জগমোহন' (পরিদর্শন কক্ষ'), 'নাটমন্দির' ও 'ভোগমণ্ডপ' যা ওড়িশি স্থাপত্যের মন্দিরগৃহকে সম্পূর্ণ করে, 'রঘুনাথবাড়ি'তে তা সম্পূর্ণরূপে লক্ষ্য করা যায়। এরূপ 'ঠাকুরবাড়ি' বা 'টেম্পল কমপ্লেক্স' পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় আরো আছে। রঘুনাথবাড়ি এখন শ্মশানপুরী ও জঙ্গলাকীর্ণ ও অসামাজিক লোকজনের বিচরণস্থল।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র
প্রণব
পড়ুন ও পড়ান

সেদিন ছিল ফলহারিণী কালিকাপুজো

নবকুমার ভট্টাচার্য

দিনটা ছিল ১২৭৯ বঙ্গাব্দের ২৪ জ্যৈষ্ঠ। আর ইংরেজি মতে ১৮৭২ সালের ৫ জুন। এই অমাবস্যা তিথিতেই হয় ফলহারিণী কালীপুজো। এই পুণ্য উৎসবের দিনে সেদিন সকাল থেকেই দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে আনন্দের সমারোহ। মন্দিরে এইদিন এক বিশেষ পর্ব। মহাকালী আদ্যাশক্তি— ভিন্ন ভিন্ন রূপে তাঁর প্রকাশ। মহাকালীরই একরূপ ফলহারিণী কালীর মধ্যে প্রকাশিত। মানুষ কর্মফল নিয়েই বেশি চিন্তিত এবং বিব্রত। ফল লাভেই হয় কর্মের উদ্দেশ্য। মা ভবতারিণী মন্দিরে এইদিন ঠাকুরের ভাগিনেয় হৃদয় মুখুজ্যে এবং মা সারদার সম্পর্কে ভাশুর পুত্র মুকুন্দপুরের দীনু পূজারি বিশেষ পুজোর আয়োজন করতে ব্যস্ত। মন্দিরে সর্বত্র কর্মচাঞ্চল্য।

সন্ধ্যা হয়েছে। কিন্তু এই উৎসবমুখর মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণ নেই। তিনি সকল কোলাহল থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখে আশ্রয় নিয়েছেন নিজের ঘরে। আছেন একান্তে। শ্রীজগদম্বাকে শ্রীবিদ্যা বা ত্রিপুরাসুন্দরীর ষোড়শী মূর্তিতে আরাধনা করার জন্য মানসিক দিক থেকে প্রস্তুত হচ্ছেন। তবে এই মহাপুজোর আয়োজন মন্দিরে হয়নি। শ্রীরামকৃষ্ণের ইচ্ছানুসারে গুপ্তভাবে আয়োজন হয়েছে তাঁরই নিজের ঘরে।

ঠাকুরের সকল পুজো অর্চনার আয়োজনেই হৃদয় মুখোপাধ্যায় সঙ্গী হন। কিন্তু সেদিন মন্দিরে বিশেষ উৎসব, তাঁকে কালীমন্দিরে বিশেষ পুজোর ব্রতী হতে হবে। তাই তিনি মন্দিরেই থাকলেন। তবু এরই মাঝে এক ফাঁকে ঠাকুরের ঘরে এসে সাহায্য করে আবার মন্দিরে ফিরে গেলেন। অবশ্য রাধাগোবিন্দের রাত্রিকালীন সেবাপুজো সম্পন্ন করার পর দীনু পূজারি এসে উপস্থিত হলেন ঠাকুরের ঘরে। রহস্যাবৃত এই পুজোর আয়োজন সম্পন্ন করতে। দীনু পূজারি বহু দিনের অভিজ্ঞ পুরোহিত। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি পুজোর যাবতীয় উপকরণ প্রস্তুত করে ফেললেন।

এই পুজোয় আরাধ্যাদেবীর কোনো প্রতিমা নেই। নেই কোনো প্রতিকৃতি। কেবল আরাধ্যা দেবীর জন্য একটি আলপনা দেওয়া সুন্দর পীড়ি পাতা রয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে যে চৌকির ওপর ঠাকুর নিজে শয়ন করতেন, তারই উত্তর দিকে পূজকের সম্মুখে স্থাপন করা হয়েছে সেই আলপনা শোভিত পিঁড়ি। সমস্ত কাজ শেষ করে দীনু পূজারি ফিরে গেলেন। ঘরে তখন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ একা। অন্যদিকে ধীরে ধীরে রাত বাড়তে থাকে। উৎসব মুখর মন্দির প্রাঙ্গণের যাবতীয় কোলাহল এক সময় শান্ত হয়ে যায়। একে একে নিভে গেছে প্রদীপমালাও। অমাবস্যার ঘোর অন্ধকারে ঢাকা পড়ে যায় বিশ্বচরাচর। কেবল গঙ্গার অনিবার জলস্রোতের শব্দ মাত্র। আর কেউ নেই দেবীর এই রহস্য পুজোর আসরে উপস্থিত থাকার জন্য। ঠাকুর তখন মা সারদাকেই সাদরে আমন্ত্রণ জানালেন। সেই ঘোর অমাবস্যার রাতে শঙ্কা বুকে নিয়ে মা সারদা এসে উপস্থিত হলেন শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে। ঠাকুর পুজোয় বসলেন আর মা সারদা বসলেন সেই পুজোর একমাত্র সাক্ষীর আসনে। ঠাকুর পূর্বমুখ হয়ে পশ্চিমদিকের দরজার কাছে বসেছিলেন।

পুজোর বিধি অনুসারে ঠাকুর মন্ত্রপাঠ করে পুজোর উপকরণ এবং দ্রব্যগুলিকে শোধন করলেন। ন্যাস প্রাণায়াম করে নিজে শুদ্ধ হলেন। পুজোর প্রাথমিক পর্ব শেষ করার পরই শ্রীরামকৃষ্ণ সেই আলপনা শোভিত আসনে সারদাকে বসার জন্য ইঙ্গিত করলেন। এতক্ষণ পুজো দেখতে দেখতে মা সারদার অর্ধবাহ্যদশা উপস্থিত হয়েছিল। কেমন যেন অর্ধঅচেতন অবস্থা তাঁর। ঠাকুরের ইঙ্গিতে তিনি উঠে দাঁড়ালেন কিন্তু কেন তিনি উঠে দাঁড়ালেন, কীই বা করতে যাচ্ছেন ইত্যাদি ভেবে দেখার মতো মানসিক অবস্থা তখন তাঁর নেই। তিনি যেন আত্মস্থবির এক নারী মাত্র। ঠাকুর সেই জীবন্ত মাতৃ-প্রতিমার দিকে মুখ করে একাগ্রচিত্তে মন্ত্র উচ্চারণ করতে শুরু করলেন— 'ন মীমাংসকা নৈব কালাদিতর্কা, ন সাংখ্যা ন যোগা ন বেদান্তবেদাঃ। ন দেবা বিদুস্তে নিরাকারভাবং ত্বমেকা পরব্রহ্মরূপেণ সিদ্ধা।' ঠাকুর প্রার্থনা জানালেন 'হে সর্বশক্তিশ্বর মাতঃ ত্রিপুরাসুন্দরী, সিদ্ধিদ্বার উন্মুক্ত কর। এঁর (মা সারদা) শরীর মনকে পবিত্র করে এর মধ্যে আবির্ভূতা হয়ে সর্বকল্যাণ সাধন কর।' এরপর ঠাকুর সাক্ষাৎ দেবীজ্ঞানে তাঁকে ষোড়শোপচারে পুজো করলেন এবং ভোগ নিবেদন করে নিবেদিত বস্তুর কিছু অংশ নিজের হাতে মায়ের মুখে তুলে দিলেন। মাতৃমূর্তি তখন আত্মসমাহিতা। সে এক অপূর্ব অবস্থা। পূজ্যা যখন সমাধিস্থা, পূজক তখন দেবীর সঙ্গে আত্মস্বরূপে পূর্ণভাবে মিলিত ও একীভূত হয়ে গেলেন।

সেই নীরব নিথর পূজ্য-পূজকের নিমিলিত চোখের সামনে দিয়েই কালতরঙ্গ প্রবাহিত হয়ে গেল। এভাবেই কিছুক্ষণ অতিবাহিত হলো। নিস্তব্ধ জগৎ চরাচর নিশ্বাস বন্ধ করে যেন সেই অপূর্ব মিলন দৃশ্যের নির্বাক সাক্ষী।

বহুক্ষণবাদে ঠাকুরের মধ্যে আত্মজাগরণের কিছু কিছু লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে উঠতে শুরু করল। পূর্বেকার সেই অর্ধবাহ্যদশায় ফিরে গেলেন তিনি। তারপর এক সময় ভাব সমাহিত শ্রীরামকৃষ্ণ দেবীকে করলেন আত্মনিবেদন। এই অপূর্ব দেবীসাধনার এখানে শেষ নয়। আত্মনিবেদনেই সর্বস্ব নিবেদিত হয়নি। তাই এরপর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের সঙ্গে নিজ সাধনার ফল সহ যথাসর্বস্ব দেবীর শ্রীচরণে চিরকালের জন্য বিসর্জন দিলেন। ঠাকুর বললেন— 'ন তে নামগোত্রে ন তে জন্মমৃত্যু, ন তে ধাম চেষ্টে ন তে দুঃখসৌখ্যে। ন তে মিত্রশত্রু ন তে বন্ধমোক্ষৌ, ত্বমেকা পরব্রহ্মরূপেণ সিদ্ধা।'

দেবতার মন্দির। মন্দিরের সামনে ভক্তদের প্রণাম করার উৎসাহ। কেউ দুহাত কপালে ঠেকান, কেউবা বুকে। কেউ হাত জোড় করে প্রণাম করেন, কেউ বা মন্দিরের দেওয়ালে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করেন। আজকাল গুরুজনদেরও প্রণাম করার সময় শরীর সামান্য ঝুঁকিয়ে এক হাতে গুরুজনদের হাঁটু বা ওইরকম কোথাও স্পর্শ করা হয়। একে কি প্রণাম বলে?

প্রণাম বলতে শরীর নত করে হাত জোড় করে মাটিয়ে মাথা ঠেকিয়ে আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন। প্রণাম হবে সাষ্টাঙ্গ। এতে শরীরের অষ্ট অঙ্গ যেমন মাথা, হাত পা, বুক জানু মাটিয়ে ঠেকিয়ে ভূলুণ্ঠিত হয়ে ভক্তি শ্রদ্ধা নিবেদন করা। দেবতাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করাই বিধি। 'স্তত্বা চ বিবিধৈঃ স্তোত্রৈঃ সাষ্টাঙ্গং প্রণমেদ্‌বিধি।' ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বৈষ্ণবদের সামনে সাষ্টাঙ্গ হতেন।

আমরা প্রণাম করি অর্থাৎ নিজেকে অন্তত ওই সময় টুকুর জন্য প্রণম্য দেবদেবী বা ব্যক্তির পায়ে সমর্পণ করছি। রবীন্দ্রনাথ সেজন্যই বলেছেন—

'একটি নমস্কারে প্রভু, একটি নমস্কারে। সকল দেহ লুটিয়ে পড়ুক তোমার এ সংসারে।' কবি ভগবানের চরণধূলার তলে তাঁর মাথা নত করে দেওয়ার মিনতি জানিয়েছেন। তাঁর এও কামনা যে একই সঙ্গে তাঁর সকল অহঙ্কারও যেন চোখের জলে ডুবে যায়। কবি যেন বিশ্বপিতার চরণধুলার তলে মাথা নত করার সঙ্গে সঙ্গে সকল অহঙ্কারের নাশকে সম্বন্ধযুক্ত করেছেন। এটা একটা শর্ত যে প্রণাম সার্থক হতে হলে অহঙ্কারের লেশমাত্র থাকলে চলবে না। যারা দেবদেবী, পিতামাতা, গুরুজনদের সামনে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করতে পারেন না তাঁদের এই অক্ষমতার পেছনে অহঙ্কার বোধ থাকে। আজকের কোনো সন্তানই বোধহয় চরণে মাথা ঠেকিয়ে পিতামাতাকে প্রণাম করেন না। মহাভারতে যক্ষ যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্ন করেছিলেন কে পৃথিবী থেকে গুরুতর? কে আকাশ থেকে উচ্চতর? যুধিষ্ঠির উত্তরে বলেছিলেন— মা

মনুষ্যত্বের আঙ্গিক প্রণাম

পৃথিবী থেকেও গুরুতর এবং পিতা আকাশ থেকেও উচ্চতর। আমাদের শাস্ত্র বলছে— মা হচ্ছেন স্বয়ং পার্বতী আর পিতা মহাদেব। তবুও দেখা যাচ্ছে পিতা-মাতাকে প্রণাম করার সময় মাথা নত হচ্ছে না। এখানে দেখা যাচ্ছে সন্তান যে বড় হয়ে গেছে প্রণাম করার সময় এ বোধটা তার যাচ্ছে না।

গীতার একাদশ অধ্যায়ে বিশ্বরূপদর্শনের পর অর্জুন ভগবানের মহত্ত্ব এবং মাহাত্ম্য সম্যক হৃদয়ঙ্গম করলেন। নিজের ক্ষুদ্রতা আর ভগবানের বিরাটত্ব অনুভব করে অর্জুনের মনে তখন আর অহঙ্কারের লেশমাত্রও নেই। সেই অবস্থায় ভগবানের স্তব করতে করতে বলছেন—

'তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং
প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্।
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢুম্।।'

শ্রীভগবানকে অতুলপ্রভাব এবং চরাচর বিশ্বজগতের পিতা এবং পূজনীয়, সেইসঙ্গে গুরুরও বন্দনীয় জ্ঞান করে অর্জুন শরীরকে দণ্ডবৎ অবনত হয়ে প্রণাম করে তাঁর প্রসাদ প্রার্থনা করছেন। অর্জুনের অহঙ্কার এবং মোহ তখন অবশ্যই বিদূরিত। তাই অতি সহজেই তিনি শরীরকে দণ্ডবৎ অবনত করে প্রণাম করতে পারছেন। সেই সঙ্গে প্রসারিত করছেন তাঁর বিনীত প্রার্থনা। এই অর্জুনই কিন্তু গীতার প্রারম্ভে তাঁর সারথি কৃষ্ণকে দুই সেনার মাঝখানে তাঁর কপিধ্বজ রথস্থাপন করার আদেশ দিয়েছিলেন। তখন তাঁর ভাব তিনি রথী এবং শ্রীহরি তাঁর সারথি।

প্রণাম অর্থে আত্মনিবেদন। আমরা যখন প্রণাম করছি তখন তাঁর কাছে প্রকৃষ্টভাবে নত হচ্ছি। তখন আমাদের শরীর মন বুদ্ধি এবং অহঙ্কারকে আমরা নম্র নিবেদনে সেখানে সমর্পণ করছি। সৌন্দর্যলহরীর একটি শ্লোকে রহস্য করে বলা হয়েছে— 'পিতামাতার সঙ্গে মধুর বাক্য ব্যবহারই হচ্ছে জপ, তাঁদের সেবা হচ্ছে মুদ্রা, তাঁদের অন্নসহ বিভিন্ন ভোগ্যবস্তু প্রদান হচ্ছে আহুতি আর তাঁদের আনন্দ দান করাই হচ্ছে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম। তন্ত্রশাস্ত্রে গুরুপরম্পরা বৈশিষ্ট্যে প্রণাম একটি বিশিষ্ট আঙ্গিক। গুরুর কাছে আত্মনিবেদন না করলে সাধনায় সিদ্ধিলাভ অসম্ভব। অবশ্য শিবস্বরূপ আচার্য শিষ্যের পাপ দগ্ধ করেন এবং তাকে সিদ্ধি প্রদান করেন বলেই তিনি গুরু। স্মৃতিশাস্ত্রে যদিও পিতামাতাকে মহাগুরু বলা হয়েছে। সুপ্তসাধনতন্ত্র মতে বলা হয়েছে— পিতামাতার পাদপদ্মের অর্চনা করলেই সমস্ত জগৎ অর্চিত হয় আর যিনি গুরুপদার্চনা করেন তাঁর আর দান তপস্যা তীর্থসেবাদির কোনো প্রয়োজন নেই। কুলার্ণবতন্ত্রের মতে পিতামাতা সহ গুরুজনদের শুশ্রূষার দ্বারা মানুষের সব পাপ ক্ষয় হয় এবং পুণ্যরাশি বর্ধিত হয়। পিতামাতা তুষ্ট হলে পুত্র স্বয়ং শিব হয়ে যান। সুতরাং যে পুত্রকন্যারা বৃদ্ধাবস্থায় অসহায় পিতামাতাকে সেবা শুশ্রূষা না করে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দায়িত্ব এড়িয়ে যায় তারা পাষণ্ড ছাড়া আর কিছুই নয়। কুলার্ণবতন্ত্র বলছে— 'মাতাভক্তিবিহীনস্য তপোবিদ্যা কুলং ব্রতম্। সর্বং নশ্যতি তত্রৈব ভূষণং লোকরঞ্জনম্' আবার ওই শাস্ত্রে অন্যত্র রয়েছে- 'পিতাভক্তিবিহীনস্য বিফলং সাধনং প্রিয়ে!'

ন.ভ.

বিষ্ণুর পরিচয়

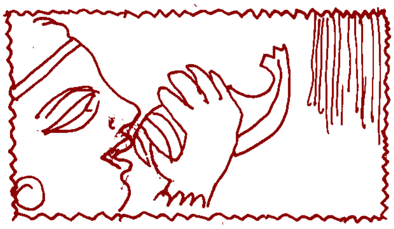

বিষ্ণুর নাম— নারায়ণ, কৃষ্ণ। ইনি ব্রহ্মাদি ত্রিমূর্তির একতম এবং সৃষ্টির পালক। লেকরক্ষার জন্য ইনি নানা অবতারে আবির্ভূত হয়ে মধুকৈটভ, হিরণ্যাদি লোকশত্রুকে বিনাশ করেছেন। ইনি ক্ষীরোদশায়ী। এঁর শয্যা অনন্ত। স্ত্রী লক্ষ্মী। পুত্র কামদেব। ধাম বৈকুণ্ঠ। বাহন গরুড়। এঁর শঙ্খের নাম পাঞ্চজন্য। চক্র সুদর্শন। গদা কৌমোদকী। মণি কৌস্তভ। ইনি দেবগণের শ্রেষ্ঠ। ইন্দ্রাদি দেবতারা বিপদের সময় এঁর শরণাপন্ন হন।

প্রজাপতি কশ্যপের ঔরসে অদিতির গর্ভে বিষ্ণু জন্মগ্রহণ করেন। এঁর দুই স্ত্রী— লক্ষ্মী ও সরস্বতী। পৃথিবীর কল্যাণের জন্য, দেবতাদের সাহায্য করবার জন্য ও দানবদক্ষদের জন্য ইনি যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করেন। পুরাণে এর দশ অবতারের কথা লিখিত আছে। যথা— মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, রাম, পরশুরাম, বলরাম, বুদ্ধ ও কল্কি। তিন যুগে ইনি বহু দৈত্য-দানবকে বধ করেছেন। যেমন মধু, ধেনুক, পুতনা, যমলার্জুন, কালনেমি, ছয়গ্রীব, শটক, অরিষ্ট, কৈটভ, কংস, কেশী, শাল্ব, বাণ, কালীয়, নরক, বলি, শিশুপাল ও আরও অনেক দৈত্যকে।

এঁর চার হাত। এক হাতে পাঞ্চজন্য শঙ্খ। দ্বিতীয় হাতে সুদর্শন চক্র। তৃতীয় হাতে কৌমোদকী গদা। চতুর্থ হাতে পদ্ম। এঁর ধনুকের নাম শার্ঙ্গ। অসির নাম নন্দক। এঁর বক্ষে কৌস্তভমণি। এবং শ্রীবৎস নামে এক অদ্ভুত চিহ্ন অঙ্কিত। এঁর মণিবন্ধে স্যমন্তক মণি বর্তমান। বিষ্ণু ঋক্‌বেদের অনেক সূক্তে বন্দনা পেয়েছেন। কোনো কোনো স্থানে আদিত্য আর তিনি অভিন্ন। কোথাও তিনি মিশে আছেন সূর্যরশ্মির সঙ্গে। ইনি সপ্তকিরণের সঙ্গে ভূ-পরিক্রমা করেন। ইনি রক্ষক। ধর্ম ধারণ করেন। ইনি ইন্দ্রের সখা। ইনি ত্রিপদে জগৎ জুড়ে আছেন।

আর্যদের তিন প্রধান দেবতার মধ্যে বিষ্ণু অন্যতম। তিনি সদ্‌গুণের আধার। সৃষ্ট জগতের পালন তার তাঁর উপর অর্পিত। তিনি পরমাত্মা, পুরুষ, অব্যয়, ঈশ্বর, অনাময়, বিশ্বব্যাপী ও প্রভু। প্রলয় সমুদ্রে ভাসমান অবস্থায় নারায়ণরূপে মনুষ্যদেহধারী হয়ে তিনি শেষনাগের উপর শায়িত। তাঁর নাভি উদ্ভূত পদ্ম হতে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার উৎপত্তি হয়। জগৎ-সৃষ্টিকালে মধু ও কৈটভ নামে দুই দানবকে হত্যা করে তাদের মেদ থেকে তিনি মেদিনী সৃষ্টি করেন। মহাভারত ও পুরাণে বিষ্ণু প্রজাপতি ও শ্রেষ্ঠ দেবতা।

প্রজাপতি হিসেবে তাঁর তিনটি অবস্থার উল্লেখ আছে। প্রথমে সক্রিয় সৃষ্টিকর্তারূপে ব্রহ্মা, যিনি নিদ্রিত বিষ্ণুর নাভিপদ্ম থেকে উত্থিত হয়েছেন। দ্বিতীয় বিষ্ণু স্বয়ং রক্ষক হিসেবে অবতার। যথা— শ্রীকৃষ্ণ। তৃতীয় শিব বা রুদ্র, বিষ্ণুর কপাল-উদ্ভূত ধ্বংসের দেবতা।

ঋণস্বীকার : সুধীরচন্দ্র সরকার সংকলিত 'পৌরাণিক অভিধান'।

ছবি : রমাপ্রসাদ দত্ত

বই কথা কই

সারাজীবনের সঙ্গী রবীন্দ্রনাথ

আদুরিদের বাড়ির সকলে রবীন্দ্রনাথের ভক্ত। সে অনেক গান শোনে। ছবি দেখে। তার খুব পছন্দের গান 'আমরা সবাই রাজা রাজার রাজা।' রবীন্দ্রনাথের কথা তাকে বলেছে ছোটকাকু ও আরও অনেকে। বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের লেখা বই আর রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে লেখা বই আছে কিছু। বইগুলো যত্নে ব্যবহার হয়। রবীন্দ্রনাথের বেশি বয়সের ছবিটাই মনে গাঁথা আছে। বাবার কাছে শুনেছে ছোটবেলায় ঠাকুর্দা রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন বাড়িতে পালন করতেন। একটা বড় ছবি সাজানো হোত। ছবিতে কোনো মালা দেওয়া হোত না। সামনে একটা বড় পিতলের ঘটে ফুল রাখা হোত। নিচে লেখা থাকত : 'এই প্রভাতে সেই আমি'। রবীন্দ্রনাথের নিজের আঁকা ছবি আদুরি দেখেছে। বেশ অন্যরকম। আদুরি ছোট্ট হাতে প্রণাম করে রবীন্দ্রনাথের সামনে দাঁড়িয়ে। মা আলপনা দেয়। তার মা রবীন্দ্রনাথের গান আপনমনে গায়। ছবির সামনে বসে গান গায়। সকলে মিলে রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন পালন হলো ওদের বাড়িতে। আদুরির মনের মধ্যে একটার পর একটা ছবি ভেসে ওঠে। মা বলেছে, রবীন্দ্রনাথকে সারাজীবন সঙ্গী করলে মন-আনন্দে ভরে যায়।

বইমিত্র

প্রশ্নবাণ

১. অজ্ঞাতবাস কালে দ্রৌপদীসহ পঞ্চপাণ্ডব কোথায় ছিলেন? কার কি ছদ্মনাম ছিল?

২. প্রাচীন ভারতে চতুরাশ্রম কি কি ছিল?

৩. সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে রবীন্দ্রনাথ কি বলতেন? তাঁর পুত্র-কন্যার নাম?

৪. 'স্বরবিতান' গ্রন্থের পরিচয় কি?

৫. রবীন্দ্রনাথের জীবনী চিত্র কে তৈরি করেন? কোন্ সালে? তাঁর বাবা ঠাকুর্দা রবীন্দ্রনাথের প্রিয়জন ছিলেন। তাঁদের নাম?

উত্তর : ১. মৎস্যরাজ বিরাটের প্রাসাদে। যুধিষ্ঠির-কঙ্ক। ভীম-বল্লভ। অর্জুন-বৃহন্নলা। নকুল-গ্রন্থিক। সহদেব-তন্ত্রিপাল। দ্রৌপদী-সৈরিন্ধ্রী। ২. ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস। ৩. মেজদাদা। ইন্দিরা দেবী, সুরেন্দ্রনাথ। ৪. রবীন্দ্রনাথের গানের স্বরলিপি। ৫. সত্যজিৎ রায়। ১৯৬১ সাল। সুকুমার রায়। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী।

ফিরে পড়া

কেন চেয়ে আছ গো মা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১৮৬১-১৯৪১)

কেন চেয়ে আছ গো মা, মুখপানে।
এরা চাহে না তোমারে চাহে না যে, আপন মায়েরে নাহি জানে।
এরা তোমায় কিছু দেবে না, দেবে না—মিথ্যা কহে শুধু কত কী ভানে।
তুমি তো দিতেছ মা, যা আছে তোমারি—স্বর্ণ শস্য তব, জাহ্নবীবারি,
জ্ঞানধর্ম কত পুণ্যকাহিনী।
এরা কী দেবে তোরে। কিছু না, কিছু না। মিথ্যা কবে শুধু হীন পরানে।
মনের বেদনা রাখো মা মনে। নয়নবারি নিবারো নয়নে।
মুখ লুকাও মা, ধূলিশয়নে— ভুলে থাকো যত হীন সন্তানে।
শূন্য-পানে চেয়ে প্রহর গণি গণি দেখ কাটে কিনা দীর্ঘ রজনী।
দুঃখ জানায়ে কী হবে জননী, নির্মম চেতনাহীন পাষাণে।

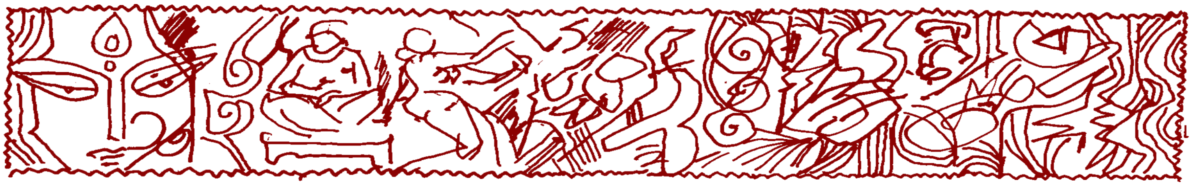

মেয়েদের ভোট-ভাবনা

শবরী ঘোষ

ভারতে লোকসভা, বিধানসভা এবং পঞ্চায়েত ও পুর নির্বাচন মিলিয়ে প্রায় প্রতিবছরই কোনো না কোনো ভোটপর্ব অনুষ্ঠিত হয়। ভারতের জনসংখ্যার প্রায় ৪৮ শতাংশ নারী। ভোটবাক্সে পুরুষদের পাশাপাশি তাদেরও একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ইদানীং মহিলাদের জন্য ভোটে বেশ কিছু আসন সংরক্ষণ করা হয়েছে। সর্বভারতীয় এবং আঞ্চলিক স্তরের দলগুলিতে দেখা যাচ্ছে বহু মহিলা মুখ। কেন্দ্র এবং রাজ্য মন্ত্রিসভায় এসেছেন বেশ কিছু মহিলা সদস্য। কিন্তু ভোটকে কেন্দ্র

করে সাধারণ মহিলাদের চিন্তাভাবনা ঠিক কোন খাতে প্রবাহিত হয় তা নিয়ে আজও বহু তরজা চলে।

জনতার একাংশের অভিমত হলো আমাদের দেশে মেয়েদের রাজনৈতিক সচেতনতা এখনো পর্যন্ত কিশলয় স্তরেই রয়ে গিয়েছে। মুষ্টিমেয় কয়েকজন শহুরে উচ্চশিক্ষিত মেয়েকে বাদ দিলে অধিকাংশের মধ্যেই রাজনীতি সম্পর্কে একরকম উদাসীনতা এবং কিছুটা যেন বিতৃষ্ণাও লক্ষ্য করা যায়। অনেকে তো ভোটকে নিছক একটা ছুটির দিন বলেই মনে করেন। শুক্রবার বা সোমবারে ভোটের দিন স্থির হলে অনেকেই স্বামীকে অনুরোধ করেন ছোটোখাটো 'ট্যুর'-এ নিয়ে যাওয়ার জন্য। গ্রাম, মফস্‌সল এমনকী শহুরে অল্পশিক্ষিত গৃহবধূদের অনেকেই নাকি স্বামী বা শ্বশুরের উপদেশমত তাঁদের পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দেন। অতএব ভোটবাক্সে মেয়েদের মানসিকতার সঠিক প্রতিফলন দেখা যায় না।

একথা সত্য যে, স্বাধীনতার ৬৮ বছরেও ভারতে মেয়েদের আশানুরূপ সামাজিক অগ্রগতি হয়নি। এখনো অনেকে মেয়েদের 'দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক' বলে মনে করেন। মেয়েদের শিক্ষিত, সচেতন নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার চেয়ে তাদের পাত্রস্থ করাটাই এক শ্রেণীর অভিভাবকের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষা না থাকলে রাজনৈতিক সচেতনতা আশা করা যায় না। মেয়েরা চাঁদিফাটা রোদ উপেক্ষা করে ভোটের লাইনে দাঁড়ান তাঁদের কতজনের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা আছে— এই দুর্ভাগ্যজনক প্রশ্নটার তাই আজও বিরাম নেই।

শিক্ষকতার সুবাদে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ আমার হয়েছে। সেই ফাঁকে ভোট সম্পর্কে তারা কী ভাবেন তার কিছুটা আমি জানার চেষ্টা করি। ছাত্রীদের একটা অংশ যারা এ বছর প্রথম ভোট দেবার অধিকার পেয়েছে তাদের বেশিরভাগের ভাবনার বিষয় হলো— বেগুনি রঙের কালিমাখা আঙুল উঁচিয়ে মোবাইলে তাদের তোলা নিজস্বী দেখে সোশ্যাল ওয়েবসাইটগুলিতে কতজন লাইক দেবে! কাউকে আবার ভোটের দিন বোমাবাজির আশঙ্কায় বাবা বা দাদারা বাইরে বেরোতেই বারণ করে দেন। অধিকাংশ ছাত্রীর মত হলো, তাদের অভিভাবকরা যে যে রাজনৈতিক দলের সমর্থক বা সদস্য তারা সেই দলকেই ভোট দেবে। তবে ব্যতিক্রমী কয়েকজন ছাত্রী অবশ্য বলেছে যে, 'ভোটটা তাঁকেই দেব যিনি মানুষের উন্নতির জন্য কাজ করেন বলে আমরা জানি।' বিদায়ী প্রার্থীর আমলে এলাকায় কী কী কাজ হয়েছে বা বর্তমান নির্বাচনে কোন প্রার্থী কী ইস্তাহার ঘোষণা করেছেন সে বিষয়ে এদের মধ্যে স্পষ্ট ধারণা রয়েছে। সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ না করলেও এদের মধ্যে কিন্তু রাজনীতি সম্পর্কে আগ্রহ রয়েছে। মধ্যবয়স্ক মহিলারা নিয়মিত পানীয় জল সরবরাহ, নিকাশি ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ বিলের পাশাপাশি নারীসুরক্ষার দিকে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছেন।

আমাদের দেশের অধিকাংশ মহিলার জীবন কেটে যায় রান্না আর ঘরকন্নার ঘেরাটোপে। লক্ষ্য করে দেখা যায়, খিড়কি থেকে সিংহদুয়ারের ছোট্ট পৃথিবীটাই যাদের একমাত্র পরিচয়; লোকসভা নির্বাচনের সময়েও জমি বিল, পরমাণু অস্ত্র চুক্তি, তিস্তার জলবণ্টন বা টু জি স্পেকট্রাম কেলেঙ্কারির চেয়েও পানীয় জল, নর্দমা সংস্কার বা বিদ্যুৎবিভ্রাটের মতো একান্ত আঞ্চলিক বিষয়গুলো তাদের কাছে বেশি গুরুত্ব পেয়ে থাকে। রুপোলি পর্দার নায়ক-নায়িকা যদি ভোটে প্রার্থী হন তাহলে তো কথাই নেই। গরিব মানুষের কষ্টার্জিত অর্থ আত্মসাৎ করা লগ্নি সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন কিনা সে কথা না জেনেশুনে শুধুমাত্র এঁদের 'ঘরের বউ' বা 'দাদা' জাতীয় ইমেজ দেখে লোকসভায় যখন এই মেয়েরা বিপুল ভোট দেন, তার দায় কাদের? মেয়েদের প্রকৃত অর্থে শিক্ষিত করে তোলা, তাদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার স্ফুরণ ঘটানোর যে দায়বদ্ধতা আমরা আমাদের পূর্ববর্তী প্রজন্ম বা সরকারের থেকে আশা করেছিলাম তা তারা পূরণ করতে পারেননি।

স্বাধীন ভারতে প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্তরে মুষ্টিমেয় মেয়েকে দেখা যায়। তাই, সাধারণভাবে মেয়েদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতার অভাব আমাদের পীড়িত করে। মনে রাখতে হবে, দেশের একটা অংশ পিছিয়ে পড়লে কিন্তু সমগ্র ভারত পিছিয়ে পড়তে বাধ্য।

গো-হত্যা বন্ধ করা স্বাধীনতা সংগ্রামেরও অ্যাজেন্ডা ছিল

গান্ধীজী বলেছিলেন, ‘বেশ কিছু ক্ষেত্রে আমি গো হত্যার বিষয়টিকে স্বরাজ্যের থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি। আমার মতে, গোহত্যা ও নরহত্যা একই মুদ্রার দুটি পিঠ।’

অতিথি কলম

ভরত ঝুনঝুনওয়ালা

গোমাতা আমাদের সমস্ত অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপকে প্রভাবিত করে। এই ধ্রুব সত্যটি প্রাচীন ভারতে উপলব্ধ হয়। সেজন্যই ভাবাবেগ, ধর্মীয় এবং বিশাল অর্থনৈতিক গুরুত্ব গোমাতার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

গো-হত্যা বন্ধের ব্যাপারে কেন্দ্রের মোদী সরকার যে আলোচনা চালাচ্ছে তা নতুন কিছু নয়। এটি একটি স্পর্শকাতর বিষয়। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় থেকেই এই বিষয়টি বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু। সংবিধান বিষয়ে বিতর্কের সময়ও এই বিষয়টি উত্থাপিত হয়। বর্তমান এনডিএ সরকার ভারতে গো-হত্যা বন্ধের ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কিছু কিছু রাজ্য আইন করে গো-হত্যা নিষিদ্ধ করেছে। তবুও গো-বংশ ক্রমহ্রাসমান। কৃষকের কাছে গো-প্রতিপালন অ-লাভজনক হয়ে উঠছে।

গোরুকে খড় খাওয়ানো হয়। কিন্তু গোরু যে গোবর দেয় তা জমির উর্বরতার ক্ষেত্রে অপর্যাপ্ত ছিল। মাঠে চরে ঘাস খেয়ে গোরু যে গোবর দেয় তা খড় খাওয়া গোবরের থেকে উর্বর। আগে গ্রামগুলিতে খোলামাঠে গোরু চরে বেড়াত এবং মাঠের ঘাস খেত। খড় রূপে বিকল্প কোনো খাবারের প্রয়োজনই হোত না। একজন রাখাল গোরুগুলিকে গোচারণ ক্ষেত্রে নিয়ে যাওয়া এবং আসার জন্য যেটুকু টাকা নিত, সেটুকুই ছিল গোপালনের জন্য খরচ। বলতে গেলে, প্রায় বিনামূল্যেই আমরা গোরু থেকে দুধ এবং গোবর পেতাম। মাঠের ঘাস এবং খড় খাওয়ার পর যে গোবর পাওয়া যেত তা মাটির পুষ্টিগত ভারসাম্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে অতুলনীয় ছিল। কিন্তু এই পরিস্থিতি আজ পাল্টে যাচ্ছে; গোচারণক্ষেত্রে আজ অবলুপ্তির পথে। সেই সব জমি বিদ্যালয়, আবাসন ইত্যাদি তৈরির কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। ফলত গোচারণক্ষেত্র কমছে এবং তার ফলস্বরূপ গোবরের পরিমাণ ও গুণগতমানও কমছে। গোরু আজ খড়ের ওপর বেশিমাত্রায় নির্ভরশীল। গোবরের পরিমাণ কমে যাওয়ার জন্য কৃষকদের বেশি পরিমাণে রাসায়নিক সারের ওপর নির্ভর করতে বাধ্য হচ্ছে। রাসায়নিক সার প্রয়োগে অভ্যস্ত হয়ে ওঠার জন্য গোবর সংগ্রহ করা, তা জমিয়ে রাখা এবং চাষের মাঠে ছড়িয়ে দেওয়াকে চাষিরা আজ খুব অসুবিধাজনক বলে মনে করছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে গোবরের জন্য গোরু্র প্রতি চাষির নির্ভরশীলতা ক্রমশ কমছে। গত ছ'য়ের দশকে আমাদের দেশ যখন খরায় আক্রান্ত হয়েছিল, তখন জরুরি ভিত্তিতে সারে ভরতুকি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আমরা আজও অসঙ্গতভাবে এই নীতিকে চালিয়ে যাচ্ছি। কৃষকরা সস্তায় রাসায়নিক সার ব্যবহার করতে পারছে। ফলত গোবর সারের জন্য গো প্রতিপালনে আগ্রহী হচ্ছে

> **“সরকারি নীতিগুলির মধ্যে গো-অর্থনীতিকে বেশি করে প্রাধান্য দেওয়া উচিত। সরকারি নীতি এমন হওয়া উচিত, যাতে কৃষক গো- প্রতিবালনকে অ-লাভজনক বলে মনে না করে। সরকারের অর্থনৈতিক নীতির সংশোধন চাই। তারপর গো-হত্যা নিষিদ্ধকরণের জন্য আইন প্রণয়ন করতে হবে।”**

“আমাদের দেশে গোরু প্রতিবছর প্রায় ১০০ মিলিয়ন টন গোবর দেয়, যার মূল্য ৫০০ কোটি টাকা এবং এর ফলে ৫০ মিলিয়ন টন জ্বালানি কাঠ সঞ্চিত হয়। ফলত, প্রচুর গাছ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায় এবং পরিবেশের ক্ষতি ব্যাহত হয়। হিসেব করা হয়েছে যে, যদি ৭৩ মিলিয়ন পশুর পরিবর্তে ৭.৩ মিলিয়ন ট্রাক্টর চাষের কাজে লাগানো হয়, সেগুলির প্রতিটির দাম ২.৫ লক্ষ এবং সর্বমোট ১,৮০,০০০ কোটি টাকা একসঙ্গে প্রয়োজন। এর সঙ্গে আবার ২ কোটি ৩৭ লক্ষ ৫০ হাজার টন ডিজেল দরকার, যার অর্থ আরো ৫৭,০০০ কোটি টাকা। আমরা এইসব পশুর ওপর কতটা পরিমাণ ঋণী তা এর থেকেই পরিষ্কার। আর এইসব পশুকে হত্যা করে আমরা কী বিশাল ক্ষতি করছি তা নিজেরাই জানি না।”

—মানেকা গান্ধী

না। পূর্বতন এনডিএ সরকার উন্নত দেশ থেকে গোবর আমদানির প্রস্তাব দিয়েছিল। কিন্তু তা অনুমোদন পায়নি। মাটির জৈবিক ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য গোবর থেকে প্রাপ্ত জৈব সার দারুণ প্রভাবী। অপরদিকে অজৈব এন.পি.-কে সার মাটিকে শক্ত করে তোলে এবং মাটির প্রাণবন্ত ভাবকে নষ্ট করে। কাজেই পূর্বতন এনডিএ সরকারের পথই আজ অনুসরণ করতে হবে। সরকারের গোবর আমদানি করে তা সারে রূপান্তরিত করে ভরতুকি দিয়ে কৃষকদের দেওয়া উচিত। এই পদক্ষেপ কৃষকদের জৈবসার ব্যবহারে রুচি বাড়াবে এবং তাদের গো-প্রতিপালনে উৎসাহিত করবে। এর ফলে মাটির গুণগত মানও বজায় থাকবে।

গোরু মাঠে চরাতে নিয়ে যাবার জন্য রাখাল বালকদের মজুরি আজ আকাশছোঁয়া। Mahatma Gandhi National Rural Employment Gurantee Act (MGNREGA) অনুযায়ী কৃষিক্ষেত্রে নিযুক্ত শ্রমিকদের পারিশ্রমিকও বেড়েছে। আবশ্যিক শিশু শিক্ষা বিস্তারের সুবাদে গোরুর পালকে মাঠে নিয়ে যাবার ছেলেরও অভাব। এইসব নানা কারণে গো-প্রতিপালন আজ খুবই কষ্টকর কাজ। গোরুর থেকে মহিষ প্রতিপালনকে চাষিরা বেশি লাভজনক মনে করছে। গোরুর থেকে মহিষ বেশি অলস ও ঘরকুনো। সারাদিন গোয়ালঘরে বসে থাকতে বেশি পছন্দ করে। বিদেশি প্রজাতির জার্সিগাইও মহিষের মতো আরামপ্রিয়, কিন্তু জার্সিগাইয়ের দুধ দেশি গোরুর দুধের থেকে কম পুষ্টিকর। সরকারের উচিত এমন একটি প্রকল্প নেওয়া, যার দ্বারা আরামপ্রবণ দেশি গোরুর জন্ম দেওয়া যায়, যাতে করে গোরুকে চরানোর খরচ কমবে। সারা পৃথিবীর মধ্যে ভারতের গবাদিপশু চোখে পড়ার মতো।

আমাদের ৩০টি প্রজাতির গোরু, ২০টি প্রজাতির ছাগল, ৪০টি প্রজাতির ভেড়া, ১২টি প্রজাতির মহিষ, ৮টি প্রজাতির ঘোড়া, ৬ প্রজাতির উট এবং অনেক প্রজাতির ভারবাহী গাধা ও খচ্চর আছে।

বিশ্বের ৭০টি দেশের ভারতীয় ‘জেবু’ (কুঁজযুক্ত) প্রজাতির গোরুর খুব চাহিদা। এই প্রজাতির গোরুর বিশেষ কিছু গুণ আছে, যা আমদানি করা গোরু বা সঙ্কর প্রজাতির গোরুর মধ্যে নেই। জেবু গোরুর দুধ অনেক উন্নত। রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য বিশেষ প্রতিরোধক ক্ষমতা এই দুধে আছে। তুলনায় কম খাবার খেয়ে এই গোরু বেশি দুধ দেয়।

ট্রাক্টরের ব্যবহার বলদের চাহিদাকে কমিয়ে দিয়েছে। এই যন্ত্রের জন্য আমরা খাদ্যে স্বনির্ভর হয়েছি। বিশাল এলাকা কম সময়ে চাষ করা সম্ভব হচ্ছে এবং চাষযোগ্য জমির পরিমাণও বেড়েছে। কিন্তু এর ফলে বলদের পরিমাণ কমে গেছে এবং কৃষক মহিষ পালনে বেশি আগ্রহী।

মহিষের দুধে গোরুর দুধের থেকে বেশি ফ্যাট থাকে, কিন্তু ‘Solid Non Fats’ (SNFs) গো-দুগ্ধে বেশি আছে। এই এসএনএফ শিশুর মস্তিষ্কের বিকাশের জন্য খুব দরকারী। সাধারণ মানুষ মহিষ দুধ ও গো-দুগ্ধের এই পার্থক্য জানে না। তারা তাই বাজারে ‘গো-দুগ্ধ’ না চেয়ে দুধ চায়। পাউচের ওপর গো-দুগ্ধ না মহিষ দুগ্ধ লেখা এবং তার এসএনএফ এর পরিমাণ উল্লেখ করা বাধ্যতামূলক করা উচিত। এর সঙ্গে জনগণের গো-দুগ্ধের উপকারিতা সম্পর্কে অবগত করানোর জন্য ব্যাপক কার্যক্রম নেওয়া উচিত। এইসব পদক্ষেপ নেওয়া হলে মহিষ দুধের তুলনায় গো-দুগ্ধের চাহিদা ও দাম বৃদ্ধি পাবে এবং চাষি গোপালনে উৎসাহী হবে।

দেশে গোমূত্রের ঔষধিগুণের ওপরে অনেক গবেষণা হচ্ছে। এমন বহু ব্যক্তিকে আমি জানি যাঁরা গোমূত্রের ক্যাপসুল খেয়ে উপকৃত হয়েছেন। কিন্তু এইসব ওষুধ উৎপাদনকারী গোরুর সংখ্যা কম। এইসব সুবিধা গো-অর্থনীতিতে যুগান্তকারী পরিবর্তন আনতে পারবে।

গান্ধীজী বলেছিলেন, ‘বেশ কিছু ক্ষেত্রে আমি গো হত্যার বিষয়টিকে স্বরাজের থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি। আমার মতে, গোহত্যা ও নরহত্যা একই মুদ্রার দুটি পিঠ।’

সরকারি নীতিগুলির মধ্যে গো-অর্থনীতিকে বেশি করে প্রাধান্য দেওয়া উচিত। সরকারি নীতি এমন হওয়া উচিত, যাতে কৃষক গো- প্রতিবালনকে অ-লাভজনক বলে মনে না করে। সরকারের অর্থনৈতিক নীতির সংশোধন চাই। তারপর গো-হত্যা নিষিদ্ধকরণের জন্য আইন প্রণয়ন করতে হবে।

(লেখক একজন প্রবীণ স্তম্ভলেখক)

রক্ত-সঙ্কট মোচনে ব্যাপক জনচেতনা প্রয়োজন

রমাপ্রসাদ দত্ত

গরমের দিন এলে শরীর সহজে যেন মানিয়ে নিতে পারে না আবহাওয়াকে। কম বেশি কষ্ট থাকে। গ্রাম শহর সব জায়গাতেই একই অবস্থা। গ্রামে গাছপালা যদি-বা কিছু থাকে, শহরে একেবারে বৃক্ষহীন অবস্থা। যে কটা আছে তাতে প্রয়োজন মেটে না। অক্সিজেনের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাবে কে? পর্যাপ্ত গাছ থাকলে কিছুটা স্বস্তি মিলত। এখন চারদিকে কংক্রিটের জঙ্গল। বাতাস নেই। বসবাসের ঘর যেভাবে তৈরি সেখানে আলো ঢোকে কম, বাতাসেরও ঢুকতে মানা। রক্ষা পাবার জন্যে প্রায় সারাবছরই কৃত্রিম হাওয়ার ব্যবস্থা। তার মানে বিজলী পাখা চলছে। পাখা বন্ধ হলেই ঘুম বিশ্রামে ব্যাঘাত। একসময় তালপাতার বাতাসে কাজ হয়ে যেত। এখন সারাদিনই পাখা চলছে। অনেকে স্নানের ঘরে পর্যন্ত বিজলী পাখা লাগান বাড়তি আরামের জন্যে। বিদ্যুৎ খরচ বাড়ে তাতে। বাড়ুক, স্বস্তি তো মেলে। যাঁদের আর্থিক ক্ষমতা বেশি তাঁরা গরমের কষ্ট থেকে রেহাই পাবার জন্যে আরেকটু এগিয়ে যান। ঘরে এয়ারকুলার এয়ারকন্ডিশনের ব্যবস্থা হয়। লোকজন কোনো প্রশ্ন করলে তৈরি জবাব থাকে, 'নিজের জন্যে নয়। বাড়ির লোকজনের কষ্ট সহ্য করা যাচ্ছে না। কিনে ফেললাম ঠাণ্ডা যন্ত্র।' ফ্রিজ এখন ঢুকে গেছে বাড়িতে। ঘর ঠাণ্ডার যন্ত্র আনতে অসুবিধে নেই। বাড়তি আয়ের ব্যবস্থা হয়ে যাবে। এদিক ওদিক থেকে এসে যাবে। নয়তো ধারে বা কিস্তিতে কেনা যেতে পারে। আরাম চাই। আশেপাশের বাড়িতে ঘর ঠাণ্ডার যন্ত্র এসে গেছে। বাড়ির মেয়ে বউ ছেলেমেয়েদের মানসম্মান রক্ষার জন্যে ঠাণ্ডা মেসিন চাই। এসে গেল। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এয়ার কন্ডিশন ঘরে বসবাস ঠিক নয়। কিন্তু হিতোপদেশ কে শোনে! গরমে কষ্ট পাওয়ার থেকে একটু স্বস্তিদায়ক ব্যবস্থা হলে কাজকর্ম মন দিয়ে করা যায়। হয়তো সত্যি।

এই গরমে রক্তের চাহিদাও বাড়ে। গরমে রক্তও টগবগ করে ফোটে কিনা কে জানে। রক্তের চাহিদা সেজন্যেই বাড়ে? মানুষের প্রয়োজনে মানুষের রক্তই চাই। রক্ত কৃত্রিমভাবে তৈরি করা যায় না। রক্ত চাই জীবনধারণের জন্যে, জীবন বাঁচানোর জন্যে। অসুস্থ বা রক্তাল্পতায় ভোগা মানুষের জন্যে তাজা রক্তের প্রয়োজন। চাহিদার তুলনায় যোগান খুব কম। সুস্থ মানুষের রক্ত সংগ্রহ করে তা বিশেষভাবে সংরক্ষণ করা হয়। সব রক্ত সব মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। রক্ত পেলে জীবন সংশয় অনেকটা দূর হয়। রক্তের গ্রুপ মেলা চাই। গ্রুপ মানে রক্তের কুলগোত্র বিচার করে কার্ড তৈরি হয়। সামাজিক মানমর্যাদা বাড়ে, বজায় থাকে। কিন্তু সবসময় ঠিকভাবে রক্ত পরিচয় না জানা থাকলে সমস্যা দেখা দিতে বাধ্য। কোনো চিকিৎসাকেন্দ্রে অসুস্থ বা আহত ব্যক্তির দেহে যেকোনো রক্ত ঢুকিয়ে দেওয়া যায় না। যদি যেত তাহলে রক্তের সমস্যা এত থাকত না। রক্ত সহজে মিলত। জীবনদায়ী ওষুধের মতোই রক্তও অমূল্য। কোনো কোনো গ্রুপের রক্ত সহজে মেলে। কোনো গ্রুপের রক্ত সহজে মেলে না। হাতের নাগালে যা মেলে তা দেওয়া সম্ভব নয়।

আমাদের দেশে জনসংখ্যার চাপ বাড়ছে যেভাবে তার সঙ্গে রক্তের চাহিদাও বেড়ে চলেছে। রক্তদানের সপক্ষে কথা বলা হচ্ছে বারবার। আন্দোলন গড়ে উঠেছে। জনহিতের জন্য রক্তদান। একজন সুস্থ মানুষ বছরে তিন থেকে চারবার রক্তদান করতে পারে। সেই রক্ত অসুস্থ মানুষের প্রয়োজনে লাগে। কিছুকাল আগে অনেক বাড়ির লোকজন রক্তদানে উৎসাহ দিতেন না। উপদেশ দিতেন, 'অন্য লোকজন দিচ্ছে দিক। তুই

দিস না।’ রক্ত দিলে শরীরের ক্ষতি হয় না। যেটুকু রক্ত দেওয়া হয় তা পূরণ হতে দিন কয়েক সময় লাগে। তিন মাস অন্তর রক্তদান করলে শরীরও ভালো থাকে।

গরমের দিনে রক্তের প্রয়োজন বাড়ে, তবে শীতকালে যেরকম হারে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয় গরমের দিনে তা হয় না। যদি ঠিকভাবে রক্ত সংরক্ষণ করা যায় তাহলে তা কয়েকমাস থাকে। ওই কয়েকমাসের মধ্যে কারও না কারও প্রয়োজন হয়। অনেক সময় রক্ত ব্লাডব্যাঙ্ক থেকে মেলে না। রোগীর রক্তের গ্রুপ ও রক্তদাতাদের রক্ত গ্রুপ এক কিনা যাচাই করে সঙ্গে সঙ্গে রক্ত নেওয়ার ব্যবস্থা হয়। আবার কোনো কোনো সময় কোনো রোগীর সমস্ত রক্ত বদলাতে হয়। যাকে বলে ব্লাড ট্রান্সফিউশান। সেক্ষেত্রে রক্তের পরিমাণ বেশি লাগে। সংগ্রহ করা সহজকর্ম নয়। কোনো মানুষ রক্তাল্পতায় ভুগলে তাকে সুস্থ করার জন্যে তার রক্তের গ্রুপের সঙ্গে মেলে এমন কারো রক্ত দিলে সমস্যা মেটে। কিন্তু রক্তগ্রহণ সংরক্ষণ ও আদান প্রদান পদ্ধতিতে গোলমাল থাকলে সঙ্কট অন্য চেহারা নেয়।

রক্তদান সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে দেশের প্রয়োজনের তুলনায় কম। সকলে সুস্থ সুখী থাকতে গেলে শরীর ভালো রাখা দরকার। আবহাওয়া ঠিক না থাকলে সুষম পুষ্টিকর খাদ্য না পেলে শরীর খারাপ হবে। সাধারণ চিকিৎসা ব্যবস্থা সকলের নাগালে না থাকলে সমস্যা বাড়বে। নানান কারণে সাধারণ মানুষ গুরুতর আহত হলে কঠিন অসুখ করলে রক্তের প্রয়োজন থাকে। রক্ত কম থাকলে জীবন রক্ষা কঠিন। চিকিৎসা চালানোও কঠিন। প্রয়োজনীয় রক্ত পেলে অসুস্থের নতুনভাবে জীবনীশক্তি পেয়ে সুস্থ হয়ে ওঠার সম্ভাবনা থাকে।

দেশের অধিকাংশ মানুষের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে অভাব অশিক্ষা অপুষ্টি অসুখ। এগুলোর দাপট থাকলেই রক্তাল্পতা দেখা দিতে বাধ্য। শরীরে রক্ত যদি ভারসাম্য না রাখতে পারে তাহলে অনেকরকম অসুবিধে দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা রয়ে যায়। একটি জীবনকে রক্ষা করার কাজে চেষ্টা চলে। ওষুধপথ্য সেবা মেলে। রক্তের প্রয়োজন হলে সহজে তা মেলে না। রক্ত এমন কোনো মণিহারী দ্রব্য নয় যে নগদ টাকা দিলেই দেদার মিলে যাবে! রক্তের জন্যে প্রতীক্ষা করতে হয়। শুধু বিত্ত প্রদর্শনে মিলবে, এমন সহজলভ্য দ্রব্য নয়।

আমাদের সমাজবিজ্ঞানীরা বারবার মনে করিয়ে দিচ্ছেন, রক্তের প্রয়োজন যথেষ্ট। রক্তদানের মানসিকতা সর্বস্তরে যুবক থেকে প্রবীণদের মধ্যে স্বত:স্ফূর্তভাবে জাগলে দেশসেবার অনেকটা কাজ দিব্যি এগিয়ে যাবে, যেতে বাধ্য। শুধু গ্রীষ্মের দিনে নয় সারা বছরের কথা ভেবে রক্তদান আন্দোলনে সক্রিয় সহযোগিতা ও সমর্থন প্রয়োজন সর্বস্তরের নাগরিকের।

দুঃখের বিষয়, এখনও আমাদের পেরোতে হবে অনেক পথ। সমস্যা সমাধানে খানিকটা এগোতেই আরো সমস্যা এগিয়ে আসে। রক্তদান আন্দোলনে সব দল মত গোষ্ঠীর মানুষ অংশ নিলে সংকট যত প্রবল ও বিরাট হোক না কেন তার মোকাবিলা সম্ভব।

নেপাল ও ভারতে ভূকম্প দুর্গতদের
সেবাকাজে মুক্তহস্তে দান করুন

চেকে / নগদে সাহায্য পাঠানোর ঠিকানা

BASTUHARA SAHAYATA SAMITI
Camp office : Keshab Bhawan
9-A, Avedananda Road, Kolkata -6
Ph. : (033) 2350-8075

সরাসরি ব্যাঙ্কে সাহায্য পাঠানোর জন্য

UCO BANK,
Beadon Street Branch
A/c. No. 17390100003251
IFSC / RTGS code : UCBA0001739
আপনার দেওয়া সাহায্য আয়করের 80G (5)(vi) ধারায় আয়করমুক্ত

সবার প্রিয়
বিল্লদা ®
চানাচুর
‘বিল্লদাকুঞ্জ’
কালিকাপুর, বোলপুর, জেলা : বীরভূম
ফোন : ০৩৪৬৩ ২৫২৪৪৭
মো : ৯৪৩৪৩০৬৭৯৬ / ৯২৩৩১৮৯১৭৯

যোগে অরুচি? বিয়োগ কর

অসিতবরণ আইচ

—বিয়োগ করো মানে?

—তুমি তো বললে তুমি যোগাসন, যোগ প্রাণায়াম, যোগসাধনা, যোগধ্যান— এসব একদম পছন্দ করো না। ওগুলো নাকি আর এস এসের ষড়যন্ত্র। আধুনিকতা ও বিজ্ঞানবিহীন প্রাচীনকে আঁকড়ে ধরা সঙ্কীর্ণ হিন্দুত্ব। মূর্খ অজ্ঞ পরশ্রমজীবী সাধুজী-বাবাজীদের কাছে আত্মসমর্পণ। প্রগতিবিরোধী— যত্তসব! তাই বলছি ঠিক আছে— ঠিক আছে, তোমাকে একটুও যোগ করতে হবে না। তুমি শুধু বিয়োগ কর। বিয়োগসাধনা হোক তোমার জীবনব্রত।

—বিয়োগ-সাধনা ব্যাপারটা কী?

—দ্যাখো সত্যি কথা বলতে কী, বিয়োগ সাধনাই প্রকৃত সাধনা। আমরা হিন্দু-অহিন্দু, আস্তিক-নাস্তিক, ভারতীয়-অভারতীয় সকলেই নিত্যযোগী বা নিত্যযুক্ত। এটা আমরা বুঝতে পারি না। যে বাধাগুলো আমাদের বুঝতে দেয় না সেগুলোই প্রকৃত মল। আর সেই মল দূর করা বা বিয়োগ করা হলো আমাদের সাধনা। দেহ-মন-বুদ্ধির মল দূর করতে হবে, বুঝলে?

—আমাকে কী করতে হবে?

—প্রথমে দেহের মল বিয়োগ কর। নইলে ভদ্রসমাজ দূরে থাক নিজের কাছেই নিজের শরীর ঘৃণ্য হয়ে যাবে। তুমি তো দিনে পাঁচ-ছ'বার খাচ্ছো, অথচ মল ত্যাগ করছো সপ্তাহে দু-দিন মাত্র। গোরু-ছাগলও এমন করে না। শোনো, রাত্রে সকাল সকাল খেয়ে নেবে। রাতে পেট ভরে খাবে না। খাওয়ার এক ঘণ্টা পর গরম দুধ বা গরম জল চুমুক দিয়ে খাবে। রাত দশটার মধ্যে শুয়ে পড়ো। ছয় থেকে সাত ঘণ্টা ঘুমোও। রাতে বাম দিকে পাশ ফিরে শোবে, আর দিনে ডান দিকে পা-টান করে শোবে। যে পা ওপরে থাকে সেটা যেন অবশ্যই সোজা থাকে। সকালে ঘুম থেকে উঠে গরম জল খাও পেট ভরে। একটু হাঁটো-চলো। খুব ভাল পেট পরিষ্কার হয়ে যাবে। স্নান করবে যতবার দেহে সয়। স্নানে দেহশুদ্ধি, জ্ঞানে বুদ্ধিশুদ্ধি, ধ্যানে চিত্তশুদ্ধি, দানে অর্থশুদ্ধি।

—সকালে চা খাবো কখন?

—যা বললাম এমনটি করবে তোমার চায়ের পিপাসা পাবে না। খুব অসুবিধা হলে সামান্য একটু দুধ ছাড়া লেবু-চা বিটনুন বা সামান্য চিনি দিয়ে খেতে পারো। জলখাবারে লুচি পরোটা চাউ বা ময়দা রোল আটার কোনো জিনিস খাবে না। জলখাবারে দই-শশা খুব উপকারী। অম্লজাতীয় বস্তু কম খেয়ে ক্ষার জাতীয় বস্তু বেশি করে খাবে জলখাবারে। লেখাপড়া শিখেছো তার প্রকাশ কোথায়? লোভের কাছে হার মেনে নিজের জীবন বিপন্ন করা শিক্ষিত বুদ্ধিমানের লক্ষণ নয়।

—আর কী করতে হবে?

—ক্ষিধে না পেলে খাবে না, আর ক্ষিধে পেলে অবশ্যই খাবে। সূর্য ওঠার আগে ঘুম থেকে উঠে স্নান সেরে নেবে। প্রয়োজনে দিনের অন্য সময়ে ঘুমিয়ে নিও। ভাত-রুটি কম খেয়ে যত বেশি সম্ভব ডাল- সবজি-ফল খাবে। ছাঁকা তেলে ভাজা খাদ্য বর্জন করবে। প্রধান খাদ্য খাবার পর অবশ্যই প্রস্রাব করবে। যত বেশি সম্ভব বসে জল খাবে এবং বসে প্রস্রাব করবে। দৈনিক আড়াই-তিন লিটার জল অবশ্যই খাবে। মনে রাখবে, গরম জল পঁয়তাল্লিশ মিনিটে হজম হয়। গরম জল ঠাণ্ডা করে খেলে দেড় ঘণ্টায় হজম হয়। আর ঠাণ্ডা জল তিন ঘণ্টায় হজম হয়। সকালে বা বিকালে

আধঘণ্টা জোরে হাঁটবে। রাতে খাওয়ার পর পনেরো মিনিট আস্তে হাঁটবে। দৈনিক পাঁচ কিলোমিটার সাইকেল চালাবে বা দশ মিনিট সাঁতার কাটবে।

—খেতে বসে জল খাওয়াটা কি ঠিক?

—দ্যাখো এ-বাপারে সকলের পক্ষে একই নিদান নেই। যাঁরা মোটা বা স্বাস্থ্য ভাল তারা খেতে খেতে একটু জল খেতে পারেন; খুব উপকার হবে। কিন্তু খাওয়ার পর রোগা, মোটা, রুগ্ন, সুস্থ, কেউ জল খাবেন না এক থেকে দু'ঘণ্টার মধ্যে। জল গ্লাসে করে খাবে। আরেকটা কথা স্মরণে রাখবে, আমিষ খাবার, যত কম খাবে তত ভাল। অনুষ্ঠান বাড়িতে গুরুপাক খাবার পর একবেলা অনাহার দেবে। সম্ভব হলে পরের দিন সকালে বমি করে অতিরিক্ত তেল বাইরে বের করে দেবে।

—শুনতে খুব ভাল লাগছে। আজ রাতেই আপনার কথামতো চলা শুরু করবো।

—আরেকটা কথা শোনো। খারাপ গন্ধে আমরা যেমন নাকে রুমাল বা হাত চাপা দিই, তেমনি খারাপ কিছু দেখলে বা শুনলে মন-চাপা দেবে।

—সেটা কিরকম?

—চোখ-কান খোলা রাখলে অনেক কিছু চোখে পড়বে, কানে আসবে কিন্তু মন দিয়ে দেখবে না, শুনবে না। অশ্লীল দৃশ্য, অশ্লীল কথা বর্জনের এই সহজ রাস্তা।

—ঠিক বুঝলাম না।

—বলছি, তোমার সামনে একটি ছেলে আর একটি মেয়ে খুব নোংরামি করছে। তোমার চোখে পড়ল। ব্যস, তুমি সেই দৃশ্য থেকে মজা বা আনন্দ নেবার জন্য আর একবারও দেখবে না। অর্থাৎ চোখে পড়েছে চোখ খোলা আছে বলেই; কিন্তু মন দিয়ে দেখবে না অর্থাৎ ওই দৃশ্য থেকে কিছু মাত্র আনন্দ নেবে না।

—বুঝলাম। সত্যি ভাল কথা বলেছেন।

—তুমি তো আবার ঈশ্বরে বিশ্বাস করো না। যদিও ঈশ্বর কারো বিশ্বাস-অবিশ্বাসের বিষয় নয়। তুমি নিশ্চয়ই নিজেকে, নিজের মনকে নিজের শ্বাস-প্রশ্বাসকে অবশ্যই বিশ্বাস করো।

—হ্যাঁ তা করি।

—তাহলে নিজের শ্বাস-প্রশ্বাসকে দেখো। দেখো অর্থাৎ উপলব্ধি করো কীভাবে বায়ু তোমার নাক দিয়ে ঢুকছে বেরুচ্ছে। তোমাকে মেরুদণ্ড সোজা রেখে পদ্মাসনে বা সিদ্ধাসনে বসে ধ্যান করতে হবে না। তুমি শুধু যখনই এবং যেখানেই সময় পাবে নিজের শ্বাস-প্রশ্বাসকে দ্যাখো। আর একটা কথা তোমাকে ঈশ্বরে বিশ্বাস করতে হবে না, নিজেকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করো। তোমাকে কে কীভাবে কখন সৃষ্টি করেছে, কে কীভাবে দেখে রাখছে, কে কীভাবে কোথায় শেষে নিয়ে যাবে শুধু সেটাই ভাবো। বাকি সব ভাবনা বর্জন করো। আর শোনো, তুমি তো শুধু মনের দাসত্ব করে চলেছো। ধীরে ধীরে মনের প্রভুত্ব করার চেষ্টা করো। পারবে তুমি, নিশ্চয়ই পারবে। আমি বুঝতে পারছি তোমার ইচ্ছাশক্তি প্রবল। আর তুমি তো একটি রাজনৈতিক দলের সক্রিয় কর্মী-সমর্থক। ভালোকে ভালো আর খারাপকে খারাপ বলতে পারলে তুমি মানুষ, নইলে তুমি পশু। তুমি স্বাধীন—নিত্য স্বাধীন, সদা স্বাধীন। কারো কাছে মাথা বন্ধক রাখবে না। দলীয় শৃঙ্খলার নামে দানবীয় শৃঙ্খলে বাধা পড়বে না। পশুরা পশুরূপে ভালো থাকে, কিন্তু মানুষ পশুরূপে কখনও ভালো থাকতে পারে না। ভালো থেকো মানুষের মতো ভালো থেকো। ■

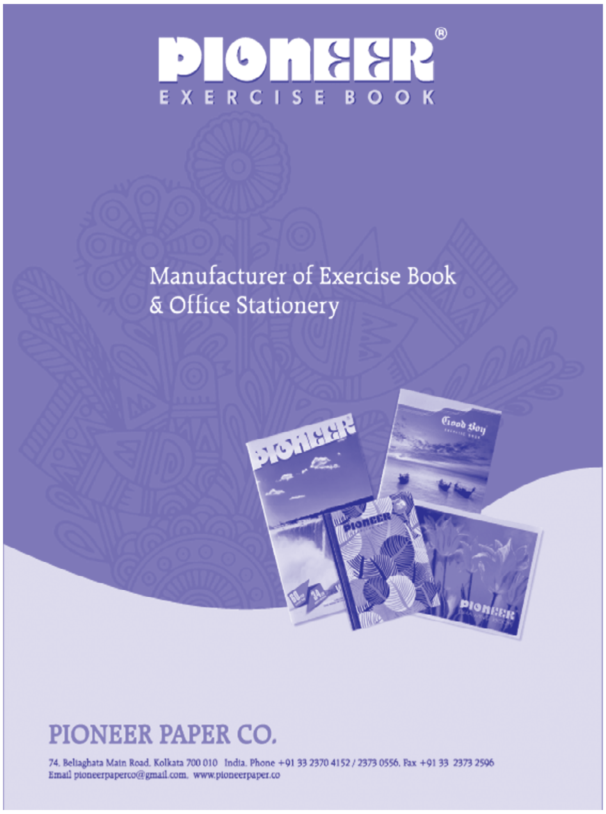

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন

মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

অন্য রকম

পুলতলার পাঠশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ মেট্রোরেলের পুলের নীচে দোকান করা দিল্লীর সাধারণ ব্যাপার। সারা দেশেও নানান ফ্লাইওভারের নীচে দোকানপাট দেখা যায়। কিন্তু যখন পুলের তলায় স্কুল চলে তখন তা অসাধারণ ব্যাপার হয়ে যায়। দিল্লী মেট্রোর যমুনাব্যাঙ্ক স্টেশনের পাশে মেট্রোব্রিজের নীচে এমনই এক অপূর্ব ও প্রেরণাদায়ী পাঠশালা রয়েছে। এই পাঠশালাকে রোদ-বৃষ্টি থেকে বাঁচানোর জন্য রয়েছে মেট্রোব্রিজের ছাদ। দেওয়ালের একধার কালো রং করে ব্ল্যাকবোর্ড করা হয়েছে। ছেলেমেয়েদের বসার জন্য আছে পিজবোর্ডের টুকরো ও চাটাই। সপ্তাহে পাঁচদিন— প্রতিদিন ২ ঘণ্টা চলা এই স্কুলে আশেপাশের কুলি-মজুর, রিক্সাওয়ালার ছেলেমেয়েরা পড়তে আসে।

অনেক শিশু দেখা যায় যাদের জেদ ও আত্মবিশ্বাস কোনো ভালো স্কুলে পড়া ছেলেমেয়ের মতো। ১০ বছরের প্রবেশের কথা— ‘বড় হয়ে ট্রেন চালাবো।’ পাঠশালা শুরুর সময় থেকেই আসা প্রবেশ জানায়, ‘আমাদের স্কুল সবচেয়ে ভালো। মাস্টারমশাইও খুব ভালো। কোনোরকম কড়াকড়ি নেই, বন্ধন নেই, খোলামেলা পরিবেশ।’ সব ছেলেমেয়েরাই একবাক্যে বলে— ‘আমাদের এই স্কুল খুব ভালো লাগে। আমরা জানি লেখাপড়া শিখে আমাদের বড় হতে হবে।’

আশা ও উৎসাহে ভরপুর এই স্কুলের শুরু কয়েক বছর আগে রাজেশকুমার শর্মা করেছেন। এখন তার বয়স ৪০ বছর। আলিগড়ের রাজেশ বি এস সি পড়া ছেড়ে দিল্লীতে আসেন। তখন তাঁর বয়স ২০ বছর। তাঁর কথায়, ‘আমার পড়াশুনা করারই ইচ্ছা ছিল। কিন্তু পারিবারিক অবস্থা এতই খারাপ যে খাবার জুটত না। তাই দিল্লীতে এসে একটা দোকান খুলি। এখন এই দোকানই পরিবারের রুটি-তরকারি যোগান দিচ্ছে।’ এই দোকান চালাতে চালাতেই রাজেশ দেখেন কুলি-মজদুর-রিকসাওয়ালা ও বাড়িতে বাড়িতে বাসনমাজা মহিলার ছোট ছোট ছেলেমেয়ে অবহেলায় যেখানে সেখানে পড়ে থাকে। এদের বাবা-মা’র সাধ্য নেই স্কুলে ভর্তি করে দিয়ে পড়াশুনা করানোর। রাজেশকুমারের কথায়— ‘এই এলাকা আমার বাসার কাছেই। তাই মনে মনে স্থির করে ফেলি এদের পড়াশুনায় উৎসাহ যোগানোর। সেইমতো কাজও শুরু করি।’

রাজেশকুমার স্কুল শুরু করেন মাত্র তিনজন বাচ্চাকে নিয়ে। কিন্তু পরেপরেই ১৪০ সংখ্যা দাঁড়িয়ে যায়। প্রথম প্রথম তিনি বেশ ঘাবড়ে গিয়েছিলেন এই ভেবে যে, এত বাচ্চাকে সামলাবেন কী করে। তখন তিনি ছেলেমেয়েদের মা-বাবার সঙ্গে দেখা করে তাদের বোঝাতে সক্ষম হন যে, ছেলেমেয়ের বয়স পাঁচ বছরের বেশি হয়ে গেলেই সরকারি স্কুলে ভর্তি করাতে হবে। তাঁর কথায় প্রত্যেক বাবা-মা রাজি হয়ে যায়। এখন পর্যন্ত তিন ৬০ জন ছেলেমেয়েকে সরকারি স্কুলে ভর্তি করিয়েছেন।

সামান্য এক মুদিখানার মালিক রাজেশকুমার, কিন্তু মেট্রোব্রিজের নীচে তাঁর স্কুলে চালানো দেখে অনেক শিক্ষিত লোকেও তাঁকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করেছেন। কেউ তাঁর প্রশংসা করলে তিনি বলেন, ‘আমি দরিদ্রনারায়ণ সেবা করছি মাত্র।’ ∎

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

স্বস্তিকা

পড়ুন ও পড়ান

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৮১০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) : ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন : ২৪১৫-৩৫৬৬

Ori Plast

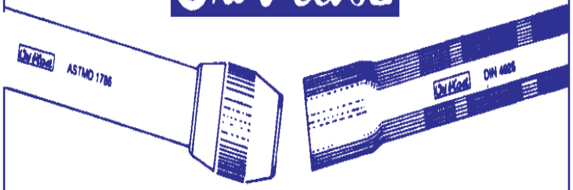

P.V.C. Threaded Pipes. For deep Tubewell & general sanitation. Substitutes to conventionnal G.I. Pipes

Authrorised Distributor :

NATIONAL PIPE & SANITERY STORES

54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831, 2210-5833

3, Jadu Nath Dey Road, Kolkata-12, Ph. 2215-6804, Fax : 2212-2803

PARTHA SARATHI CERAMICS

4, College St. Kalkata-700012. Ph. :2241-6413/5986

“ আদর্শের দিক দিয়ে একজন ভারতীয় নারীর জীবন ভারতভূমির কাব্যস্বরূপ। গত কয়েক শতাব্দীর মধ্যে পাশ্চাত্য জগৎ যে সংহতি ও সামাজিক ঐক্য হারিয়ে ফেলেছে, প্রাচ্যে তা আজও অক্ষুণ্ণ রয়েছে।”

— ভগিনী নিবেদিতা

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

রোগ নিরাময়ে আদা

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

বিভিন্ন অসুখ-বিসুখের প্রতিরোধ ও প্রতিকারের ক্ষেত্রে আদার বিশেষ ভূমিকা থাকার ফলে বিজ্ঞানী মহলে আদার কদর বহুগুণ বেড়ে গেছে।

■ নিয়মিতভাবে আদা খেতে পারলে অস্টিও আর্থ্রাইটিস ও রিউম্যাটয়েড আর্থ্রাইটিসে আক্রান্ত মানুষজন বিশেষ উপকার পাবেন। হাঁটু, গোড়ালি, কবজি, কোমর ইত্যাদি সন্ধিস্থলের তীব্র প্রদাহজনিত যন্ত্রণার উপশম ঘটিয়ে চলৎশক্তি বাড়াতে আদার gingerol নামক যৌগটি দুর্দান্ত কার্যকর। এমনকী মাংসপেশীর জড়তা কাটাতেও আদা ভালো কাজ করে। আদার 6-gingerol জাতীয় ফেনলিক যৌগটি ক্ষতিকর ফ্রি র‍্যাডিক্যালস এবং হাইলি রিঅ্যাকটিভ নাইট্রিক অক্সাইডের উৎপাদন কমিয়ে দেয়, ফলে লিপিড পার অক্সিডেশানের মাত্রাও কমে যায়। উপরন্তু দেহজাত স্বাভাবিক অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট গ্লুটাথায়োনের পরিমাণ ঠিক রাখে আদা। নিয়মিত আদা থেকে পারলে সন্ধিস্থল থেকে উৎপন্ন প্রদাহ সৃষ্টিকারী যৌগ সাইটোকাইনস ও কেমোকাইনস-এর ক্ষরণ কমে যায় ফলে বাত ব্যথাজনিত যন্ত্রণা উপশম ঘটে।

■ রক্তের কোলেস্টেরল এবং

ট্রাইগ্লিসারাইডের মাত্রা ঠিক রাখা এবং রক্তনালির অভ্যন্তরে রক্তের জমাট বাঁধা প্রতিহত করে আদা। নিয়মিত কাঁচা বা রান্নায় খেতে পারলে হার্ট অ্যাটাক ও স্ট্রোকের আশঙ্কা অনেকটাই কম থাকে।

■ সর্দিকাশি ও কোল্ড ফ্লুতে আদার নির্যাস দারুণ কার্যকর। আদা দেহের স্বাভাবিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সহায়তা করে।

■ গর্ভাবস্থায় মায়েদের বমি বমি ভাব, বমি, মাথাঘোরা, অরুচি ইত্যাদি সমস্যা দূর করতে হলে দিনে মাত্র ১ গ্রাম আদা খেয়ে দেখুন। চমৎকার কাজ দেয় এবং ওষুধের মতো কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া না থাকায় নিরাপদে ব্যবহার করা যায়।

■ বমি বমি ভাব, অম্বল, ডায়েরিয়া, পেটভার, অরুচি ইত্যাদিতে আদা দারুণ কার্যকর।

■ ট্রেন, বাস বা প্লেনে জার্নির সময় যারা বমি ভাব, মাথাঘোরা, কোল্ড সোয়েটিং ইত্যাদি সমস্যায় ভোগেন তারা জার্নি শুরুর আগে এক টুকরো আদা মুখে রেখে দেখুন।

■ নিয়মিত আদা খেতে পারলে মাইগ্রেনের সমস্যা অনেক কম থাকে। আদা প্রোস্টাগ্ল্যানডিন জাতীয় প্রদাহ সৃষ্টিকারী পদার্থের ক্ষরণ কমিয়ে রক্তবাহের মধ্য দিয়ে রক্ত সঞ্চালন বাড়ায়, ফলে যন্ত্রণা কম থাকে।

■ ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বর ও সিজন চেঞ্জের সর্দিকাশিতে আদার রস যে কী ভীষণ ভাল কাজ দেয় তা আমাদের মা-ঠাকুমাদের কাছ থেকে সকলেরই প্রায় জানা। সর্দিকাশি কমাতে আদা-চা, তুলসীপাতা-আদা- মধু-লবঙ্গ ইত্যাদির ব্যবহার হাজার বছরেরও বেশি পুরনো প্রাকৃতিক চিকিৎসা।

প্রাকৃতিক ঘরোয়া চিকিৎসায় আদা

আদার কথা বলতে গিয়ে হোম রেমেডির কথা না বললে সবটাই প্রায় অপূর্ণ থেকে যায়। সাধারণ সবজির ঝুড়ি হাতড়ে পাওয়া এক টুকরো আদাও বছরের পর বছর ধরে পরম মমতায় আমাদের যন্ত্রণায় নিরসন করছে।

■ **মাসল স্ট্রেইন ঃ** দিনে দু'বার আদার রসের সঙ্গে হলুদ বাটা মিশিয়ে খেতে হবে।

■ **ইনফ্লুয়েঞ্জা ঃ** গরমজলে আদার রস, দারচিনি গুঁড়ো এবং মধু মিশিয়ে খেলে আশ্চর্য ভাল ফল দেয়।

■ **হাঁপানি ঃ** ১ চামচ আদার রস, ১ কাপ মেথি ভেজানো জল ও ২ চামচ মধু সহ পান করুন।

■ **সর্দি-কাশি ঃ** ফুটন্ত জলে ১ চামচ আদার চূর্ণ মিশিয়ে বাষ্পটা নাকে টেনে নিতে হবে।

■ **মাথা ব্যথা ঃ** ১/২ চা চামচ আদা বাটা জলের সঙ্গে মিশিয়ে প্রলেপ।

■ **ডায়াবেটিস ঃ** প্রকৃত অর্থেই সকালবেলা খালিপেটে আদা-জল খেয়ে লাগতে হবে কাজে।

■ **পেটে গ্যাস ঃ** ২৫০-৫০০ মিগ্রা মাত্রা আদাচূর্ণ জলসহ দিনে ২/৩ বার খেতে হবে।

■ **দীর্ঘদিনের পুরনো সর্দিকাশি ঃ** ১/২ চা চামচ আদার চূর্ণ, লবঙ্গ, দারচিনি ও ১ চামচ মধু ১ কাপ গরম জলে মিশিয়ে চায়ের মতো পান করতে হবে।

সাবধানতা

মাত্রাতিরিক্ত সেবনে বুকজ্বালা, ডায়রিয়া, মুখের ভেতর জ্বলা, পেট ফাঁপা, হজমের গোলমাল ইত্যাদি সমস্যা দেখা দিতে পারে। সাপ্লিমেন্ট ব্যবহারের আগে এবং গলব্লাডার স্টোন, কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ ও ডায়াবেটিসের রোগীরা ঠিক কতটা মাত্রায় খাবেন তা জানার জন্যে অবশ্যই বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেবেন।

অ্যাসপিরিন বা হাইপারলিপিডেমিয়ার ওষুধ খেলে জিঞ্জার সাপ্লিমেন্ট খাবেন না।

কুচলিবাড়ি সংগ্রাম কমিটির আলোচনা সভা

গত ১ মে কোচবিহার শহরের কোচবিহার ক্লাব অডিটরিয়ামে বিকেল চারটে থেকে 'সীমান্ত সমস্যা ও ছিটমহল' শীর্ষক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় সহ প্রচারক প্রমুখ অদ্বৈতচরণ দত্ত, উত্তরবঙ্গ প্রান্তের সহ-প্রান্ত প্রচার প্রমুখ সাধন কুমার পাল এবং ছিটমহল গবেষক দেবব্রত চাকী। পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে সীমান্ত সমস্যা ও ছিটমহল সমস্যা তুলে ধরা হয়। তিনবিঘা করিডর বিলোপ করে আঙ্গারপোতা দহগ্রামকে ভারতের সঙ্গে যুক্ত করে ছিট বিনিময়ের দাবি তোলা হয়। কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে নোম্যানস ল্যান্ডে কয়েকশত গ্রাম, হাজার হাজার বিঘা কৃষিজমি ও লক্ষাধিক মানুষ কার্যত বন্দি অবস্থায় দিন যাপন করছে। সেখানে বসবাসকারী মানুষ পূর্ণ নাগরিক অধিকার ভোগ করতে পারে না। বিএসএফকে কৈফিয়ত দিয়ে চলাফেরা করতে হয়। এদের জীবন জীবিকার জন্য বাংলাদেশি দুষ্কৃতীদের দয়ার উপর নির্ভরশীল থাকতে হয়। খাগড়াগড় কাণ্ডের পর বাংলাদেশও সুরক্ষিত সীমান্তের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করছে। এই পরিস্থিতিতে আলোচনার মাধ্যমে ভারত-বাংলাদেশ যৌথভাবে জিরো লাইন বরাবর কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ করতে পারে কিনা এই বিষয়টি জরুরি ভিত্তিতে দেখা উচিত বলে মত প্রকাশ করা হয়। অনুপ্রবেশ, গোরুপাচার ও চোরাচালান বন্ধের দাবিতে সোচ্চার হন বিভিন্ন বক্তা।

ঝাড়গ্রামে সমাজ সেবা ভারতীর বার্ষিক কর্মশালা

ঝাড়গ্রামে ২৪ থেকে ২৬ এপ্রিল সমাজ সেবা ভারতীর এক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। বৈকাল ৫-৩০ মিনিটে দীপপ্রজ্বলন করে এই অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন প্রধান শিক্ষক ক্ষিতীশ চন্দ খাঁড়া। ভারতমাতার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন ঝাড়গ্রাম সেবা ভারতীর সম্পাদক মনোজ কুমার পাত্র। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন প্রান্ত সহ সেবা প্রমুখ ধনঞ্জয় ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গের সমাজ সেবা ভারতীর সভাপতি শিবদাস বিশ্বাস ও সহ-সম্পাদিকা মুনমুন ঘোষ। কর্মশালায় পুরুষদের জন্য উন্নত পদ্ধতিতে মৎস্য চাষ ও হাড়ের মিশ্রণে উন্নত জৈবসার তৈরির পদ্ধতি সম্পর্কে ব্যাখ্যা করে গুরুশরণ প্রসাদ। পশ্চিমবঙ্গের সমাজ সেবা ভারতীর সহ-সভাপতি বি.কে. তেওয়ারী- সহ আই আই টি খড়্গপুরের ৫ সদস্যর একটি অধ্যাপক দলের প্রমুখ অধ্যাপক এ.কে. করণ হাতেকলমে মাটি পরীক্ষা ও প্রোজেক্টারের সাহায্যে কেঁচো ও জৈবসার তৈরির প্রশিক্ষণ দেন। মহিলাদের যোগ, প্রাণায়াম গান, সরস্বতী বন্দনা ও অন্যান্য শিক্ষামূলক প্রশিক্ষণ হয়। গো-পালন বিষয়ে ব্যাখ্যা করেন দুলালচন্দ্র প্রামাণিক এবং গো-মূত্র গোবর প্রভৃতি থেকে নানা রকমের প্রোডাক্ট (সাবান, নীল, ফিনাইল, ফেসপাউডার, ক্যান্সারের ঔষধ) তৈরির পদ্ধতি শেখান। তমাল চক্রবর্তী প্রধানমন্ত্রীর নতুন যোজনা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করেন। সান্তনু চাকী বর্তমান সরকারের নতুন যে প্রকল্প চালু হয়েছে বা হচ্ছে সেই সম্পর্কে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ২৬ এপ্রিল সকালে পাঠদান কেন্দ্রের দিদিভাইদের শিশু বিকাশের জন্য তা হাতেকলমে প্রশিক্ষণ দেন মিঠুন বর্মন।

সমাবেশ সমাচার

পরলোকে মেনকা আঢ্য

স্বস্তিকা পত্রিকার সম্পাদক ড. বিজয় আঢ্য'র মাতৃদেবী মেনকা আঢ্য গত ১ মে সকাল ৭ টায় দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুরে তাঁর কন্যা সাধনা দে'র বাড়িতে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯০ বছর। বেশ কয়েকবছর ধরে তিনি বার্ধক্যজনিত কারণে শয্যাশায়ী

ছিলেন। তিনি রেখে গেছেন ৩ পুত্র, ৪ কন্যা, নাতি- নাতনি এবং অসংখ্য স্বয়ংসেবক, কার্যকর্তা ও গুণমুগ্ধদের। উল্লেখ্য, ৪ বছর আগে তাঁর দ্বিতীয় পুত্র, তৎকালীন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের সেবা প্রমুখ দিলীপ আঢ্য প্রয়াত হন। তাঁর ৪ পুত্রই স্বয়ংসেবক। জ্যেষ্ঠপুত্র বিজয় আঢ্য সঙ্ঘের দীর্ঘদিনের প্রচারক। ৺মেনকা দেবী ছিলেন এলাকার স্বয়ংসেবক ও কার্যকতাদের মমতাময়ী মাতৃস্বরূপা। শেষের দিকে কানে শুনতে ও চোখে দেখতে পেতেন না। স্মরণশক্তি প্রখর থাকায় কেউ দেখা করতে গেলে সবার খোঁজখবর নিতেন। অচেনা কেউ হলেও তার কুশল সংবাদ নিতেন। পরিচিতজনের নাম ধরে ধরে তাঁর পরিবারের সবার খোঁজ নিতেন। তাঁর প্রয়াণে স্বয়ংসেবকরা একজন মাতৃসমাকে হারালো। স্বস্তিকা পরিবার ঈশ্বরের কাছে তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করছে।

স্বস্তিকার পাঠক সম্মেলন

গত ২৬ এপ্রিল সন্ধ্যায় দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সদর শহর বালুরঘাটে ইলা ঘোষ সরস্বতী শিশুমন্দিরে স্বস্তিকা পত্রিকার পাঠক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে স্বস্তিকা পত্রিকার সহ-সম্পাদক সুকেশ মণ্ডল, প্রচার-প্রসার প্রমুখ জয়রাম মণ্ডল ও লেখক দিব্যজ্যোতি চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন।

সম্মেলন পরিচালনা করেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা কার্যবাহ তথা স্বস্তিকার কার্যকর্তা উদয়শঙ্কর সরকার। উপস্থিত স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীরা পত্রিকার প্রচার, প্রসার ও সম্পাদনার বিষয়ে মূল্যবান পরামর্শ দেন।

অনুরূপভাবে, গত ৫ ও ১৯ এপ্রিল যথাক্রমে উত্তর ২৪ পরগনার হাসনাবাদ এবং মালদহ জেলার চাঁচোল ও কলিগ্রামে পাঠক সম্মেলন হয়।

আচার্য বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী স্মৃতি ব্যাখানমালা

গত ৩ মে শ্রীবড়বাজার কুমার সভা পুস্তকালয়ের উদ্যোগে আচার্য বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী ১০ম স্মৃতি ব্যাখ্যানমালার আয়োজন করা হয় মহাজাতি সদস্য অ্যানেক্সি সভাগারে। ব্যাখ্যানমালায় প্রধানবক্তারূপে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত লেখিকা তথা গোয়ার রাজ্যপাল শ্রীমতী মৃদুলা সিংহ। 'রাষ্ট্র নির্মাণে নারীজাতির ভূমিকা' বিষয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, আচার্য শাস্ত্রী নারীজাতির প্রতি এক অপূর্ব সূত্র প্রদান করেন— 'মেয়েকে স্নেহপূর্ণ ব্যবহার এবং বধূকে সমান অধিকার। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠী। তিনি বলেন, আচার্য বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রীর আত্মা পুরোপুরি শুদ্ধ ছিল। রাজনীতি, সংস্কৃতি, সাহিত্য ইত্যাদি ক্ষেত্রকে তিনি সমৃদ্ধ করেছেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে সত্যনারায়ণ তিওয়ারী 'শ্রীরামবন্দনা' করেন। কলকাতা মহানগরের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

মঙ্গলনিধি

গত ৫ মে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মধ্যভাগের পূর্বতন সঙ্ঘচালক জীবন সাহা তাঁর কনিষ্ঠপুত্রের বিবাহের প্রীতিভোজ অনুষ্ঠানে মঙ্গলনিধি প্রদান করেন পূর্বক্ষেত্র প্রচারক প্রদীপ যোশীর হাতে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ক্ষেত্র সঙ্ঘচালক অজয় কুমার নন্দী, ভাগ প্রচারক রজত রায়-সহ বহু স্বয়ংসেবক ও কার্যকর্তা।

***

বাঁকুড়া জেলার খাতড়া মহকুমার স্বস্তিকা-কার্যকর্তা তথা স্বয়ংসেবক দুঃখভঞ্জন (ধনঞ্জয়) বাউরীর শুভ বিবাহ উপলক্ষে রাধামোহনপুর গ্রামের বাড়িতে প্রীতিভোজ অনুষ্ঠানে তাঁর বাবা ফটিক বাউরী ও মা অনিতাদেবী শ্রীফল-সহ মঙ্গলনিধি অর্পণ করেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সহ-প্রান্ত প্রচারক শ্যামাচরণ রায়ের হাতে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সঙ্ঘের বাঁকুড়া জেলা প্রচারক ভীষ্মদেব মণ্ডল, খাতড়া মহকুমা (দক্ষিণ) বৌদ্ধিক প্রমুখ সুভাষচন্দ্র দত্ত, খাতড়া সরস্বতী শিশুমন্দিরের প্রধান আচার্য তথা সঙ্কুল সংযোজক বিশ্বরূপ মণ্ডল-সহ বহু স্বয়ংসেবক ও কার্যকর্তা।

***

গত ২৩ এপ্রিল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক মেদিনীপুর জেলা ব্যবস্থা প্রমুখ অশোক ভক্তের নাতি সব্যসাচীর মুখেভাত উপলক্ষে ঠাকুমা অঞ্জলি ভক্ত মঙ্গলনিধি প্রদান করেন মেদিনীপুর নগর সেবা প্রমুখ সুরজিৎ ঘোষের হাতে।

রক্তদান ও স্বাস্থ্যপরীক্ষা শিবির

ডাঃ হেডগেওয়ার স্মারক সমিতি ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কলকাতা মধ্যভাগের উদ্যোগে গত ৩ মে কলকাতার কেশব ভবনে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। কলকাতার 'লাইফ কেয়ার' সংস্থা রক্ত সংগ্রহ করে। ৩৫ জন রক্তদান করেন। এছাড়া কলকাতার এমপি বিড়লা আই ফাউন্ডেশন ১৪৯ জনের চক্ষু পরীক্ষা করে। ৬৩ জনকে বিনামূল্যে চশমা প্রদান করা হয়। ইসিজি ও রক্ত পরীক্ষা করানো ৪৩ জনের। রক্তদান ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের উদ্বোধন করেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ক্ষেত্র সঙ্ঘচালক অজয় কুমার নন্দী। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত অস্থি বিশেষজ্ঞ ও সমাজসেবী ডাঃ পার্থপ্রতিম মুনসী, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তপ্রচারক বিদ্যুৎ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

পুরুলিয়ায় সংস্কৃতভারতীর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

গত ৩০ এপ্রিল পুরুলিয়া নগরে সংস্কৃতভারতীর দশ দিবসীয় সংস্কৃত সম্ভাষণ শিবিরের অন্তিম দিবসে অনুষ্ঠিত হয় এক মনোজ্ঞ আনন্দ সন্ধ্যা। অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের স্বামী ভূতাত্মানন্দ মহারাজ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংস্কৃতভারতীর পুরুলিয়া জেলা সভাপতি বিবেকানন্দ চট্টোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতভারতীর প্রান্ত সংগঠক প্রণবনন্দ, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বাঁকুড়া বিভাগ সঙ্ঘচালক অসিত কুমার দে, সহপ্রান্ত ব্যবস্থা প্রমুখ অশোক সাহা প্রমুখ।

শোকসংবাদ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রচারক তথা বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মালদহ জেলার লালপুর বোদরা সেবা প্রকল্প প্রমুখ স্বরূপ চট্টোপাধ্যায়ের বাবা অশ্বিনী চট্টোপাধ্যায় গত ২ মে পূর্বমেদিনীপুর জেলার গড়কমলপুর গ্রামের বাড়িতে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। তিনি ৩ পুত্র, ২ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

***

হাওড়া জেলার ডোমজুড় খণ্ডের দায়িত্বপ্রাপ্ত সঙ্ঘের তৃতীয়বর্ষ শিক্ষণ প্রাপ্ত কার্যকর্তা রূপেন ব্যানার্জীর মাতৃদেবী আরতি ব্যানার্জী গত ৩০ এপ্রিল পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তিনি ৩ পুত্র, ৩ পুত্রবধূ এবং ২ নাতি ও ২ নাতনি রেখে গেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বৎসর। সঙ্ঘের অনেক কার্যকর্তা তাঁর স্নেহপরশ পেয়েছেন।

***

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উত্তর অসম প্রান্তের মঠ-মন্দির ও অর্চক-পুরোহিত প্রমুখ প্রবোধ কুমার মণ্ডলের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গত ২৮ এপ্রিল রাত্রে বীরভুম জেলার নলহাটি থানার দেশনবগ্রামে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৫২ বছর। তিনি মা, ২ দাদা, ১ বোন, ভাইপো-ভাইঝি এবং অগণিত আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব রেখে গেছেন। উল্লেখ্য, তিনি অকৃতদার ও খুবই পরোপকারী ছিলেন।

***

উত্তর দিনাজপুর জেলার কুশমণ্ডি খণ্ডের বড়কৃষ্ণপুর গ্রামের রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক সন্তোষ সরকারের বাবা হরেন্দ্রনাথ সরকার গত ২৪ এপ্রিল পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। তিনি ২ পুত্র, ৩ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

১৯৩০ সালে জন্ম গীতা রায়ের। ১৬ বছর বয়সে, ১৯৪৬ সালে প্রথম সুযোগ পান 'প্রহ্লাদ' ছবিতে গান গাওয়ার। সেই গানের সুবাদেই ডাক পান শচীন কর্তার। গাইলেন 'মেরা সুন্দর স্বপ্না টুট গয়া...'। তারপর ৪৭ থেকে ৪৯ তিন বছর এককভাবে মুম্বইরাজ করলেন গীতা রায়। (তখনও বিয়ে হয়নি) ৪৯ সালেই মুক্তি পায় 'বরসাত', 'আন্দাজ', 'মহল' ছবি। 'মহল' এর সেই গান— 'আয়ে গা, আয়েগা আয়েগা আনেওয়ালা' সহ উক্ত তিনটি ছবিই ছিল অলটাইম হিট। গীতার সঙ্গে তখন শামসেদ বেগম, নূরজাঁহানরাও গান গাইছেন। তারই মধ্যে এন্ট্রি লতা মঙ্গেশকরের। লতার সাম্রাজ্যও এক দশক মাতিয়ে রেখেছিলেন গীতা নিজস্ব গায়ন শৈলীতে।

গীতা দত্ত

এক সুরেলা নস্টালজিয়া

রীণা চট্টোপাধ্যায়

মনে পড়ছে পঞ্চাশ-ষাট দশকের সুকণ্ঠী গীতা দত্তের কথা। তাঁর কণ্ঠে মায়াবী জাদু আজও সমান আচ্ছন্ন করে। মোহাবিষ্ট করে তোলে। কোন ছোটবেলায় শোনা সেই গান। তখন তরুণ প্রজন্ম প্রায়শই গুনগুন করতো— 'মেরা নাম চিন চিন চু / রাত চাঁদনি ম্যায় ঔর তু / হ্যাল্লো মিস্টার হাও ডু ইউ ডু' (হাওড়া ব্রিজ) গানটি। কিংবা 'সাহেব বিবি গুলাম' ছবিতে না যাও সাঁইয়া-ছুড়াকে বাঁইয়া / কসম তুমহারি ম্যায়া রো পড়ুঙ্গী.../ মূল গানটি ছিল বাংলা— 'অলির কথা শুনে বকুল হাসে/কই তাহার মতো তুমি আমার কথা শুনে হাসো না তো।' গেয়েছিলেন আর এক সোনালি যুগের গায়ক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। যাক সেটা অন্য প্রসঙ্গ। আমরা বরং ফিরে যাই সেই জীবনটির কাছে, যে জীবনটিও না লেখা একটি উজ্জ্বল কবিতার মতোই। যে জীবনের ঘাস-পাতায় লেগে আছে শিশিরের ভেজা কান্না। বলা বাহুল্য, এই প্রজন্মের যুবক-যুবতীরা হয়তো গীতা দত্তের নামই শোনেনি। শুনলেও গীতা দত্ত কোন মাপের গায়িকা ছিলেন সে সম্পর্কে সম্যক কোনো ধারণা নেই। অবশ্য সেটাই স্বাভাবিক। এই প্রজন্মের মানুষ তো রক, ডিস্কো, র‍্যাফ ইত্যাদি শুনতেই বেশি অভ্যস্ত। অনেক বেশি সাবলীল ওইসব গান সম্পর্কে দু-চার ছত্র জ্ঞানগর্ভ মন্তব্য করতেও। স্মার্ট হওয়া যাকে বলে আরকি! অবশ্য সেটা ওদের দোষ নয়— যে যুগের যেটা। কিন্তু কোনো কিছুর শুরুটাই ফাঁকি পড়ে গেলে তো জানাটাই অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

শাস্ত্রীয় বা ধ্রুপদী সঙ্গীতের কথা না হয় বাদই দেওয়া গেল। কিন্তু আধুনিক বা ছায়াছবির গানের প্রতিভাধরদের না জানলে-চিনলে চলবে কেন? গীত দত্ত, কাননবালা, নূরজাঁহান, সরাইয়া, টুনটুন (কমেডিয়ান) এদের তো সঙ্গীত দুনিয়ার অবদান কম কিছু নয়। 'বাবুজি ধীরে চল না/ প্যার মে জারা সাম্ভাল না / হাঁ বড়ে ধোকে হ্যায় ইন রাহো মে।' পঞ্চাশ-ষাট দশকের সঙ্গীতপ্রিয় মানুষরা আজও এই সব গান শুনলে অনিবার্যভাবেই নস্টালজিক হয়ে পড়েন। সে কথা জোর দিয়েই বলা যায়। 'ইয়ে লো ম্যায় হারি পিয়া / হুই তৈরি জিৎ রে / কাহে কো ঝগড়া বালম / নই নই প্রীত রে...' কিংবা 'বচপন কে দিন ভী ক্যায়া দিন থে' একদিকে যেমন শিশুসুলভ মাধুর্য অন্যদিকে কণ্ঠে সেক্স অ্যাপিলেও সমান পারদর্শী ছিলেন গীতা দত্ত।

'তদবির সে বিগরি হুই তকদির বনা লে' গান রেকর্ডিংয়ের সময় আলাপ গুরু দত্তের সঙ্গে। সেটা ৫০ সাল। আলাপ থেকে প্রেম এবং ৫৩ সালে পরিণয়। কিন্তু সুখ বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। ১৯৬৪ সালে গুরু দত্তের জীবনাবসান হয়। একাকী গীতা। স্বাভাবিকভাবেই ছেদ পড়লো সঙ্গীত সাধনাতেও। প্রথম ভারতীয় মেলেডি ক্যুইন ক্রমে সরে যেতে লাগলেন রুপালি পর্দা থেকে। প্রসঙ্গত, আশা ভোঁসলের আগমনও কিন্তু গীতা দত্তের পথ অনুসরণ করেই। যতদিন ছিলেন হিন্দি সিনেমা জগতে ততদিনই সম্রাজ্ঞীর মতো ছিলেন। লতার রমরমা বাজারেও সমান উজ্জ্বল ছিলেন এক দশক সময়। গীতা দত্তের গাওয়া 'যোগান' ছবির সেই ভজন—'মত্ যা মত্ যা যোগী...' আজও নাড়া দেয়। ১৯৭২ সালের ২০ জুলাই গীতা দত্ত ইহলোক ছেড়ে পরলোকে চলে যান। তবে মৃত্যুর পরেই বোধহয় সবচেয়ে খাঁটি মূল্যায়ন হয় লতা মঙ্গেশকরের একটি অকপট মন্তব্য— 'ওর সঙ্গে (দ্বৈত) গান গাইতে আমি ভীষণ ভয় পেতাম।' সবশেষে গীতা দত্তের গানের ভাষাতেই বলতে হচ্ছে— 'ওয়াক্ত নে কিয়া ক্যায়া হাসিন সিতম/ তুম রহে না তুম হাম রহে না হাম'।

গীতা দত্ত আমাদের থেকে ৩৫ বছর আগে চলে গেছেন। কিন্তু টলিউড তথা আধুনিক বাংলা গানের ইতিহাসে নিজেকে অমর করে রেখেছেন। 'হারানো সুর' ছবিতে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সুরে তাঁর অবিস্মরণীয় গান যা সুচিত্রা সেনের লিপে আজও ৫৭ বছর বাংলা গানের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় প্লেব্যাক হিসাবে চিহ্নিত রয়েছে। 'পৃথিবী আমারে চায়' ছবিতে মালা সিন্হার লিপে তাঁর গাওয়া নচিকেতা ঘোষের সুরে 'নিশিরাত বাঁকা চাঁদ' কি ভুলে যাওয়া সম্ভবপর? 'লুকোচুরি', 'ইন্দ্রাণী', 'ডাকহরকরা', 'স্বরলিপি' সব অসংখ্য বাংলা ছবিতে তিনি অমর হয়ে আছেন, থাকবেনও। ৫০-৬০ দশকে গীতা দত্তের সুরেলা কণ্ঠে একের পর এক যেমন বলিউডের ছবিতে তাঁর গান মাত করে দিয়েছিল, একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছিল টলিউডের বাংলা ছবি ও এইচ. এম. ভি. সংস্থার প্রকাশিত আধুনিক বাংলা গানের রেকর্ডে। প্রতিবছর পুজোয় গীতা দত্তের নতুন আধুনিক বাংলা গানের দিকে তাকিয়ে থাকতেন বাংলা গানের প্রেমিকরা।■

শব্দরূপ-৭৪৬ দেবলীনা পাল

১	■	২		৩	■	৪	■
	■			৫			■
৬			■		■		■
	■	■	■	■	৭		৮
৯	১০		■	■	■	■	
■		■	১১	■	১২		
■	১৩			■		■	
■		■	১৪			■	

সূত্র :

পাশাপাশি : **২.** হনুমানের মাতা, **৫.** বিশেষণে সরস, শেষ দুয়ে বৎসর, **৬.** বঙ্গীয় শব্দে ক্যাশ পেতে হবে, প্রথম দুয়ে পাহাড়, **৭.** বিষ্ণুর দশাবতারের অন্যতম, **৯.** এর পর শতক, **১২.** বিশেষণে কেশহীন, **১৩.** তৎসম শব্দে শিউলি, **১৪.** তৎসম তুষার, বরফ।

উপর-নীচ : **১.** ধ্রুবের পিতা, **২.** কিষ্কিন্ধ্যার এক বানর রাজা, প্রথম দু'য়ে দেহ, **৩.** কলহসংগঠক বলে খ্যাত দেবর্ষি, **৪.** প্রতিশব্দে বারিপ্রবাহ, আগাগোড়া বার্ধক্য, **৮.** দেবতরুবিশেষ, প্রথম দুয়ে বিষ্ণু, দুয়ে-তিনে ইঙ্গ ধনবান, **১০.** লঙ্কা-যুদ্ধে রাবণ এই অস্ত্র দিয়ে লক্ষ্মণকে ধরাশায়ী করেছিলেন, **১১.** এই নদীর তীরে মহর্ষি কণ্বের আশ্রম ছিল, এখানে শকুন্তলার জন্ম হয়, **১২.** গর্ত সমার্থে সমরেশ বসুর বই।

সমাধান
শব্দরূপ-৭৪৩

■	■	কা	ল	নে	মি	■	ব
বা	উ	ল	■	■	থু	■	য়
■	ড়	■	মে	■	ন	ম	স্য
■	ন	হু	ষ	■	■	হো	■
■	চ	■	■	শ	র	ৎ	■
গা	ণ্ডী	ব	■	ক্ষু	■	স	■
জ	■	ল	■	■	পা	ব	ক
ন	■	গা	ধা	বো	ট	■	■

সঠিক উত্তরদাতা
শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯
সুশীল কয়াল
কলকাতা-৬
সুনীল বিষ্ণু
সিউড়ী, বীরভূম

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়।
খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

- ৭৪৬ সংখ্যার সমাধান আগামী ২৫ মে ২০১৫ সংখ্যায়

লেখক-লেখিকাদের প্রতি

- ভারতীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রতি অনুকূল লেখাই প্রকাশ করা হয়।
- যে কোনো রকম লেখা, তা চিঠিপত্র, সংবাদ বা আলোচনা যাই পাঠান না কেন, কাগজের একপিঠে পরিষ্কার হাতের লেখায় দু'দিকে যথেষ্ট মার্জিন বা ফাঁক রেখে পাঠাতে হবে। অথবা টাইপ করে বা সিডি-তে পাঠালে ভালো হয়। কোনো লেখারই ফটোকপি গ্রাহ্য হবে না। লেখক বা লেখিকার নাম, পুরো ঠিকানা, ফোন নম্বর থাকা অবশ্যই দরকার এবং সংক্ষিপ্ত পরিচিতি থাকা বাঞ্ছনীয়। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।
- চিঠিপত্র বিভাগে লেখা পাঠালে খামের উপর 'চিঠিপত্র' কথাটি অবশ্যই লিখবেন। 'চিঠিপত্র' **১৫০টি** শব্দের মধ্যে হতে হবে। একই কথা প্রযোজ্য শব্দছকের ক্ষেত্রে। খামের উপর 'শব্দরূপ' লিখতে হবে।
- ভ্রমণ বিষয়ক লেখার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ছবি (ফটো প্রিন্ট) পাঠানো বাঞ্ছনীয়। অন্যান্য ধরনের লেখার ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় ছবি পাঠানো যেতে পারে।
- পূর্বে প্রকাশিত কোনো লেখা গ্রাহ্য হয় না। পুনঃপ্রকাশের ক্ষেত্রে স্বস্তিকা-র সম্পাদকীয় বিভাগই লেখা নির্বাচন করে থাকে।
- গ্রন্থ-সমালোচনার জন্য দু'টি বই পাঠাবেন।
- স্বস্তিকায় প্রদত্ত লেখা অন্যত্র পাঠানো অনুচিত। এক বছরের মধ্যে লেখা প্রকাশিত না হলে আমাদের জানিয়ে অন্যত্র পাঠানো যেতে পারে।
- লেখার মধ্যে কোনো উদ্ধৃতি থাকলে তার সূত্র অর্থাৎ গ্রন্থের নাম, গ্রন্থকার, প্রকাশক, সংস্করণ, পৃষ্ঠা ইত্যাদি পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।
- রচনা মনোনয়ন ও প্রকাশনার ব্যাপারে (পরিবর্তিত/ পরিমার্জিত) সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।
- লেখার সঙ্গে মূল্যবান নথিপত্র থাকলে তা লেখক-লেখিকারা নিজ উদ্যোগে ফিরিয়ে নেবেন।

।। চিত্রকথা ।। বান্দা বৈরাগী ।। ২৪

বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথের নামাঙ্কিত বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে চলেছেন। গত ৮ মে বাংলাদেশের সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করার কথা ছিল। কিন্তু এরই প্রতিবাদে রাস্তায় নামে আল-বাইয়িন্যাত নামে এক মৌলবাদী সংগঠন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের বিরোধিতা করে লিফলেট বিলি শুরু করে এই সংগঠনের নেতারা। মূলত এক হিন্দু কবির নামে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন তারা কখনই মেনে নিতে পারছে না। তাদের দাবি, নিজের দেশে প্রথিতযশা কবি সাহিত্যিককে ছেড়ে এক ভারতীয় হিন্দু কবির নামে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজন নেই। মৌলবাদী সংগঠনের সদস্যরা শাহজাদপুরে রবীন্দ্রনাথের নামে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের বিরোধিতা করে প্রচারপত্র বিলি করার সময় পুলিশ ৯ জন মৌলবাদী নেতাকে হাতেনাতে গ্রেপ্তার করে।

যোগে উৎসাহী মার্কিন মুলুক

প্রাচীনকালে মুনি ঋষিরা যোগব্যায়ামের মাধ্যমে নিজের শারীরিক সক্ষমতা গড়ে তুলতেন। অতি প্রাচীনকাল থেকে চলে আসা ভারতীয় যোগব্যায়ামের কদর পরবর্তীকালে আরও বেড়েছে। এবার তার উপযোগিতার কথা একবাক্যে স্বীকার করল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ২১ জুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালন করার সিদ্ধান্ত নিল মার্কিন কংগ্রেস। 'কংগ্রেশানাল যোগী অ্যাসোসিয়েশন' নামে এমনই এক যোগব্যায়ামের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তুলেছে ক্যাপিটাল হিল এবং মার্কিন কংগ্রেসের সদস্যরা। এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে যোগব্যায়ামের পাশাপাশি শেখানো হবে ধ্যানের উপযোগিতাও। তবে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালন করার আগেই ভারতীয় দুতাবাসের সহযোগিতায় গত ১ মে ক্যাপিটাল হিলে যোগব্যায়ামের এক বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। যেখানে উপস্থিতির হার ছিল চোখে পড়ার মতো। পাশাপাশি স্বদেশের পর বিদেশেও ভারতীয় যোগব্যায়ামের অপরিহার্যতা আরও একবার প্রমাণ করল।

জার্মানির বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের চাহিদা বাড়ছে

বিগত ৮০০ বছরের পরাধীনতার সময়ে ভারতে সংস্কৃত ভাষাকে ভীষণভাবে অবহেলা করে সমাপ্ত করার অপপ্রয়াস হয়েছে। পৃথিবীর প্রাচীনতম ভাষা, দেবভাষা হিসাবে স্বীকৃত, বিশ্বের মধ্যে যাবতীয় বিষয়ের বিপুল জ্ঞানভাণ্ডারের অসীম আধার— সংস্কৃতকে ভারতে ভারতবাসীরাই অবহেলা করে এসেছে। তার ফলে বর্তমান ভারতবর্ষে সংস্কৃতকে স্কুল পাঠ্যসূচিতে অচ্ছুৎ করে আবশ্যিক তৃতীয় ভাষার মর্যাদা থেকে সরিয়ে ঐচ্ছিক করে কয়েক প্রজন্মকে ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে জ্ঞানার্জন থেকে বিরত করা হয়েছে।

ভারতীয় হিন্দু সনাতন ভাবধারা এবং বৈচিত্র্যর মধ্যে ঐক্যের আধার ছিল সংস্কৃত ভাষা এবং সংস্কৃত সাহিত্য। এজন্য দু-একটি উদাহরণই যথেষ্ট। সারাভারতে জাগ-যজ্ঞ-পূজা-মন্দিরের সংকল্পমন্ত্র এক এবং তা সংস্কৃত ভাষায় হয়ে থাকে। স্নানের সময়ে উচ্চারিত মন্ত্রও এক— গঙ্গে চ যমুনে চৈব...সন্নিধিং কুরু।

যখন বৈদেশিক আক্রমণ হয় এবং আক্রমণকারীরা যুদ্ধে জয়লাভ করে তারা তাদের ভাষা, সংস্কৃতি ও ধর্ম বিজিত দেশের অধিবাসীদের উপর চাপিয়ে দেয় জোরজবরদস্তি করে এবং শাসক হওয়ার সুবাদে। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে এই ঘটনা প্রায় হাজার বছর যাবৎ ঘটেছে। ইসলামি আক্রমণ ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় স্বাধীনতাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করেছে। পরে যখন ইংরেজরা এদেশের শাসন ক্ষমতার চেপে বসে তখন তারা উপরোক্ত কাজ তো করেইছে, উপরন্তু সুশিক্ষা সংস্কার প্রদানকারী ভারতীয় শিক্ষা পদ্ধতির বদলে তাদের শিক্ষাপদ্ধতি ভারতবর্ষে প্রচলন করেছে। তার ফলে সংস্কৃত শিক্ষার গঙ্গাপ্রাপ্তি ঘটেছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংস্কৃতকে ব্রাত্য করে ইংরেজিকে ঢোকানো হয়েছে। এতদ্‌সত্ত্বেও ভারতবর্ষে এবং ভারতের বাইরে জার্মানিতে সংস্কৃত এবং ইন্ডোলজি বা ভারততত্ত্ব শিক্ষার চাহিদা বিপুল পরিমাণে বাড়ছে বলে জানা গেছে। হাইডেনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাউথ এশিয়া ইন্সটিটিউটে সুইজারল্যান্ড, ইতালি সহ অন্যান্য দেশ থেকে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য ব্যাপক পরিমাণে আবেদনপত্র জমা পড়েছে। একথা জানিয়েছেন ওই বিশ্ববিদ্যালয়েরই অধ্যাপক ড. এ্যাক্সেল মিচেলস্‌। জার্মানির প্রথম সারির ১৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ে, খোদ ইংল্যান্ডের চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত পঠন-পাঠন চলছে।

হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতি বছর আগস্টে বিশেষ সংস্কৃত কথোপকথন প্রশিক্ষণ চলছে। সেখানে ৩৪টি দেশের ২৫৪ জন ছাত্র-ছাত্রী ওই প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন বলে ড. মিচেলস্‌ জানিয়েছেন।

ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ বিমান বন্দর

পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বিমানবন্দরের তকমা পেল দিল্লীর ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর পরিষদ গত মার্চ মাসের ২৮ তারিখে জর্ডনে এক সমারোহে দিল্লীর এই বিমানবন্দরকে 'বিমানবন্দর সেবা গুণবত্তা পুরস্কার' প্রদান করেছে। এর ফলে ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর আবার একবার বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ তকমা অর্জন করলো। দিল্লীর এই বিমানবন্দর গত বছরই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের মর্যাদা পেয়েছে। এবছর শ্রেষ্ঠত্বের তকমার সঙ্গে সঙ্গে বিমানবন্দর কর্মচারীদেরও প্রশংসা করা হয়েছে। ■

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57 Postal Registration No. Kol. RMS/48/2013-2015
11 May - 2015 - Rs. 10.00

দাম : ১০.০০ টাকা